সন্দীপন

২

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII. Vide TB No. 76/7/TB/119 and also Board's letter No. RB/76/DS/1 Dated 24.12.76

সন্দীপন

(দ্বিতীয় ভাগ)

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য সাহিত্য-সংকলন]

অধ্যক্ষ পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় এম. এ., বি. টি.

ব্রহ্মানন্দ পি-জি-বি-টি কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া ;
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা,
ও যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অব এডুকেশন, যাদবপুর
বিশ্ববিদ্যালয় ; ভূতপূর্ব বাংলাভাষা-শিক্ষক, বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু
ইন্সটিটিউশন ; পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ প্রকাশিত
'কর্মশিক্ষা' শিক্ষক-ব্যবহারিকা পুস্তকের অন্যতম লেখক

প্রাপ্তিস্থান
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
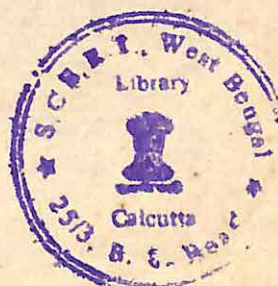
ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ ১৯৭৪ সাল থেকে যে নতুন পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করেছেন তদনুসারে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে 'সন্দীপন'—২য় ভাগ সাহিত্যপাঠখানি প্রস্তুত করা হল। মাতৃভাষা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলির কথা মনে রেখে এবং শিশুদের মানসিক বৃদ্ধি বিবেচনা করে, বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পুস্তকখানির গল্প-প্রবন্ধ-কবিতাগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলা ভাষার বনিয়াদ গড়ার কৃতিত্ব যাঁদের সেই সব অগ্রপথিক সাহিত্যসেবকবৃন্দের কালজয়ী রচনাবলীর পাশাপাশি একালের প্রতিভাবান জীবিত লেখকগণেরও রচনা দিয়ে এ পুস্তকের ডালি সাজানো হয়েছে—বাংলা ভাষা বর্তমানে কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে, তার সুস্পষ্ট ধারণা ছেলে-মেয়েদের দেবার উদ্দেশ্যে। ইদানিং কালের বাংলা-শিক্ষক-শিক্ষিকারাও, দেখেছি, তা-ই চান।

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্যে মৎ-সংকলিত 'সন্দীপন'—১ম ভাগ পুস্তকখানির মতোই এ পুস্তকেও **"কর্মশিক্ষা" ও "সমাজসেবা" সম্পর্কিত বহু নির্দেশ সন্নিবেশিত হয়েছে প্রায় প্রত্যেকটি অনুশীলনীতে** ; এর ফলে গল্প ও নিবন্ধগুলির ব্যবহারিক মূল্য অবশ্যই বাড়বে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ও চান, বাংলা-বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল সমস্ত বিষয়ই কর্মশিক্ষার সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়ে জীবনমুখী শিক্ষাদানের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে তুলুক।

যে সমস্ত পূর্বসূরী ও সমসাময়িক লেখকের রচনায় বর্তমান সংকলনটি সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছি তাঁদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করি।

পোস্টগ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজ
রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া, ২৪-পরগনা

শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

বিষয় সূচি

॥ গদ্যাংশ ॥

॥ পদ্যাংশ ॥

রতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রামবাংলার অতি-পরিচিত এক প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমিতে সরল একটি গ্রাম্য বালিকার ব্যথাভরা অন্তরের কাহিনী লেখকের 'পোস্টমাস্টার' নামক বিখ্যাত গল্প থেকে এখানে তুলে দেওয়া হল।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস, অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। বেতন অতি সামান্য—নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন—'রতন!' রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত, কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, 'কী গা বাবু, কেন ডাকছ?'

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস ?

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে—হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন—একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে তুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। পোস্টমাস্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে ?' সে অনেক কথা—কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ তুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অংকিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল—বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল ; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল—মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে ; এবং কোথাকার এক নাছোড়-বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত তুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল। পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত ! ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বার বার বলিতেছে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন!' রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দাদাবাবু, ডাকছ?' পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ—নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদ্‌লা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, 'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না—দেখ্‌তো আমার কপালে হাত দিয়ে।'

বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগো, দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি?'

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল; কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল।

উদ্‌বেলিত হৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?'

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।'

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু?

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে?

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ্‌ টপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?'

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, 'সে কী করে হবে?' ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল—'সে কী করে হবে।'

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ-প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, 'রতন, আমার জায়গায় যে-লোকটি আসবেন তাঁকে বলে

দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।'

রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাইনে।'

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রতন, তোকে আমি কখনও কিছু দিতে পারিনি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।'

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন, পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না'—বলিয়া এক-দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্যবালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।

রতন—সে সেই পোস্টআপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'তোর মাকে মনে পড়ে?'—কে, কাকে, কখন্ এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন? তিনি এ প্রশ্নের কী উত্তর পেয়েছিলেন?

২। 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না' —রতন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করেছিল কেন?

৩। পোস্টমাস্টারের গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় যা যা ঘটেছিল তা বর্ণনা কর।

৪। অর্থ বুঝিয়ে দাও : (ক) দৈবাৎ দুটি-একটি……অংকিত আছে।

(খ) সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ……বিষয় ছিল।

(গ) রতন অনেকদিন প্রভুর……সহিতে পারিল না।

(ঘ) একটি সামান্য গ্রাম্যবালিকার……করিতে লাগিল।

৫। গল্পটিতে গ্রাম্যপ্রকৃতির সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। সেগুলি বর্ণনা কর। সেগুলি অবলম্বন করে দু-একটি ছবি আঁক।

৬। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো :

গণ্ডগ্রাম, দৈবাৎ, নাছোড়বান্দা, চিক্কণ, হিল্লোল, অহর্নিশি, খুঙ্গিপুঁথি, নিষ্কৃতি, উদ্‌বেলিত, নামঞ্জুর, সমাপন, উচ্ছ্বসিত, চার্জ, গমনোন্মুখ, ভূতপূর্ব, বর্ষাবিস্ফারিত, উচ্ছলিত, অব্যক্ত।

৭। **কর্মশিক্ষা** ॥ (ক) শিক্ষকমহাশয়ের নেতৃত্বে একটি ডাকঘর পরিদর্শনের কর্মসূচি নাও। ডাকঘরের কাজকর্ম লক্ষ্য কর, ইস্কুলে ফিরে এসে 'ডাকঘর-প্রকল্পের' কাজ শেষ কর।

(খ) গল্পটিতে আটচালা আপিসঘরের উল্লেখ আছে। দোচালা, চারচালা এবং আটচালা বাড়ির ছবি, সম্ভব হলে, এঁকে দেখাও।

৮। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

গুরুতর, মসৃণ, পরাভূত, সমাপন, যত্ন, তিরস্কার, বিস্ফারিত।

৯। অনাত্মীয় বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে ছোট শিশুর মনের মিলন অবলম্বন করে আরও অনেক উৎকৃষ্ট গল্প লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথেরই 'কাবুলিওয়ালা' —পড়ে নাও।

গ্রাম বাংলার - এক নিভৃত পরিবেশে এক সরল
গ্রাম্য বালিকার - একান্ত অনুভবের কাহিনী পোস্টমাস্টার

ভারতের গৌরব

স্বামী বিবেকানন্দ
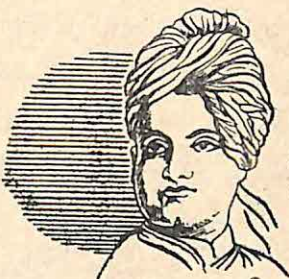
ভারতবর্ষের মহান্ সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। জাতির নিদারুণ অপমান ও দুর্দশার দিনে জাগরণের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল স্বামীজীর বজ্রকণ্ঠে। ভারতবর্ষ থেকে জলপথে ইউরোপ যাত্রা কালে স্বামীজীর দৃষ্টিতে স্বদেশের প্রাচীন গৌরবের চিত্রটি বারবার ফুটে উঠেছিল। তাঁর অমর রচনা 'পরিব্রাজক' থেকে তারই কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া হল।

সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফর্ডিনেণ্ড লেসেপ্‌স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েচে। মানবজাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করচে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেতো। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মশলার স্থান ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীন কাল হতেই, যে দেশ যখন সভ্য হত, তখনই ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত; একই ডাঙাপথে আফগানি ইরানী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে

রেড-সি হয়ে। সিকন্দর সা ইরান বিজয়ের পর নিয়ার্কুস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিত-সমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল ইরান গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতো, তা অনেকে জানে না। রোম ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীর ভিনিস ও জেনোয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্যকেন্দ্র হয়েছিল।

এদিকে পোর্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে,আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদয়া হলেন ; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য রাজত্ব সমস্তই ; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিসপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্চে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না—ভারত যে তাদের ধন-সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সেকথা মান্‌তে চায় না, বুঝ্‌তেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়বো ? ভেবে দেখ কথাটা কী ? ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি জোলা, ভারতের নগণ্য মনুষ, বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্চে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য, ওলটপালট হয়ে যাচ্চে। হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব, অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলক-সন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য আর তুমি ? কে ভাবে একথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেচেন, দশখানা কাব্য বানিয়েচেন, দশটা মন্দির করেচেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটচে ; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে ?

লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য ; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা। আমাদের গরীবেরা ঘরদুয়ারে দিন রাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই ? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয় ; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সেই তোমরা—ভারতের চিরপদ-দলিত শ্রমজীবি ! তোমাদের প্রণাম করি।

॥ অনুশীলনী ॥

১। স্থপতি কাকে বলে ? ভাস্কর বলতে কাকে বোঝায় ?

২। ভারতের বাণিজ্য এত উন্নতি করেছিল কেন ?

৩। ভারতের গরীব শ্রমিকদের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দ কীভাবে সমবেদনা জানিয়েছেন ?

৪। বুঝিয়ে দাও ঃ লোকজয়ী……কার্যকারিতা।

৫। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো ঃ

খাতস্থাপত্য, নিদর্শন, স্থপতি, উর্বরতা, কিংখাব, বিজাতি-বিজিত, আবহমানকাল, রুধিরস্রাব, কাব্যবীর, সহিষ্ণুতা, নিষ্কাম, কর্তব্যপরায়ণতা।

৬। (ক) **কর্মশিক্ষা** ॥ একটি প্রকল্প গ্রহণ কর, নাম দাও 'সুয়েজ খাল প্রকল্প'। মানচিত্র আঁক, মডেল তৈরি কর, তথ্য সংগ্রহ কর। বর্তমান নিবন্ধে উল্লেখিত নানা দেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ করে একটি দল অ্যালবাম বা চার্ট তৈরি করতে পার।

(খ) **সমাজসেবা** ॥ স্বামী বিবকানন্দের আদর্শে ইস্কুলের কাছাকাছি কোন পাড়ায় গিয়ে সমাজসেবার একটি কার্যসূচি গ্রহণ কর।

লেখকের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রারম্ভদৃশ্য থেকে সংকলিত।

[স্থান—সিন্ধু-নদতট ; দূরে গ্রীক জাহাজশ্রেণী। কাল—সন্ধ্যা]

সেকেন্দার ॥ সত্য সেলুকস। কী বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তমসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।

সেলুকস ॥ সত্য সম্রাট।

সেকেন্দার ॥ কোথাও দেখি তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন করছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য পরাজয় করে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী করে আনি যখন, সে কী বললে জানো?

সেলুকস ॥ কী সম্রাট?

সেকেন্দার ॥ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার কাছে কীরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?'—সে নির্ভীক নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিল, 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ!' চমকিত হলাম। ভাবলাম—এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।

সেলুকস ॥ সম্রাট মহানুভব।

সেকেন্দার ॥ মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসি নাই। আমি এসেছি সৌখিন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে এ দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট?

সেকেন্দার ॥ সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করতে হলে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই। কী আশ্চর্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে চলে এসেছি! ঝঞ্ঝার মত এসে মহা শত্রু-সৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।

[চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনসের প্রবেশ]

সেকেন্দার। কী সংবাদ আন্টিগোনস? ও কে?

আন্টিগোনস ॥ গুপ্তচর। আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে নির্জনে শুষ্ক তালপত্রে কী লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পারলাম না—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার ॥ কী লিখছিলে যুবক? সত্য বল।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ সত্য বলব। রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শেখে নাই। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, বূহ্য রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এইসব মাসাবধিকাল ধরে শিখছিলাম।

সেকেন্দার ॥ কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার ॥ সত্য সেলুকস?

সেলুকস ॥ সত্য।

সেকেন্দার ॥ (চন্দ্রগুপ্তকে) তার পর ?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ তারপর গ্রীক সৈন্য কাল এই স্থান পরিত্যাগ করে যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার ॥ কি অভিপ্রায়ে ?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ সেকেন্দার সাহার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নহে। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার ॥ তার পর ?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ তারপর শুনলাম মাসিডন-ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্তা। হে সম্রাট ! আমার ইচ্ছা হল যে দেখে আসি—কী সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে সমস্ত এশিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে ; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্যের মহাবীর্যও যার সংঘাতে বিচলিত হয়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা করছিলাম। আমার ইচ্ছা স্বুদ্ধ আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা, এইমাত্র।

[সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিলেন]

সেলুকস ॥ আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্তা আমার মিষ্ট লাগত। আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা করতাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক।

আন্টিগোন্‌স ॥ কে বিশ্বাসঘাতক ? এই যুবক, না তুমি ?

সেলুকস ॥ আন্টিগোন্‌স ! আমার বয়স না মানো, পদবী মেনে চলো।

আন্টিগোন্‌স ॥ জানি তুমি গ্রীক সেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস ॥ আন্টিগোন্‌স ! (তরবারি বাহির করিলেন)

আন্টিগোন্‌স ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে

চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আন্টিগোনস্ তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।]

সেকেন্দার ॥ নিরস্ত হও।

[সেই মুহূর্তেই আন্টিগোনসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল]

সেকেন্দার ॥ আন্টিগোনস্ !

(আন্টিগোনস্ লজ্জায় শির অবনত করিলেন)

সেকেন্দার ॥ আন্টিগোনস্ ! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলাম। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্ধা !—আমি এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। তোমার এতদূর স্পর্ধা হতে পারে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাও, এই মুহূর্তেই তোমায় নির্বাসিত করলাম।

(আন্টিগোনসের প্রস্থান)

সেকেন্দার ॥ আর সেলুকস ! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো যে, গ্রীক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রীক সেনাপতির শোভা পায় না।—আর যুবক ! তোমায় যদি বন্দী করি ?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ কী অপরাধে সম্রাট ?

সেকেন্দার ॥ আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছ, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ এই অপরাধে ? ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার সাহা বীর, দেখছি যে তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্র হিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত ! সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার ॥ সেলুকস ! বন্দী কর।

চন্দ্রগুপ্ত ॥ সম্রাট আমায় বধ না করে বন্দী করতে পারবেন না।

(তরবারি বাহির করিলেন)

সেকেন্দার ॥ (সোল্লাসে) চমৎকার ! যাও বীর ! তোমায় বন্দী করব

না। আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি মনে রেখো। হৃতরাজ্য উদ্ধার করবে, তুমি দুর্জয় দিগ্বিজয়ী হবে। যাও বীর! মুক্ত তুমি।

॥ অনুশীলনী ॥

১। সেকেন্দার ভারতবর্ষকে কেন বিচিত্র দেশ বলেছেন?

২। সম্রাট সেকেন্দারের চোখে আন্টিগোন্‌স, সেলুকস এবং চন্দ্রগুপ্ত—তিনজনেই অপরাধী। এই তিনজনের বিচার তিনি কীভাবে করেছিলেন?

৩। এই নাট্যাংশে সেকেন্দারের চরিত্রের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য তোমার চোখে পড়ে? এই ধরনের গুণ ভারতের ইতিহাসের আর কোন চরিত্রের মধ্যে তুমি দেখেছ কিনা বল।

৪। বুঝিয়ে দাও: (ক) প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ……দাঁড়িয়ে দেখি।
(খ) আমায় বধ না করে বন্দী করতে পারবেন না।

৫। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো:
নদতট, চন্দ্রমা, তামসী, জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রাবৃট, অভ্রভেদী, তুষার-মৌলি, হিমাদ্রি, উচ্ছ্বাস, স্বেচ্ছাচার, সৌম্য, বাত্যা, নিষ্কম্প, প্রত্যর্পণ, মহানুভব, দিগ্বিজয়, ঝঞ্ঝা, রাজাধিরাজ, ব্যূহ, অভিপ্রায়, পরাক্রম, ভ্রূকুটি, সংঘাত, বিশ্বাসঘাতক, ক্ষেপণ, নিরস্ত, ঔদ্ধত্য, গুপ্তচর, ত্রস্ত, সোল্লাসে, ভবিষ্যদ্বাণী, হৃতরাজ্য।

৬। **কর্মশিক্ষা** ॥ (ক) নাট্যাংশটি ইস্কুলে অভিনয়ের ব্যবস্থা কর। দু-একটি নতুন চরিত্র যোগ করে নিতে পার। রঙ্গমঞ্চ, সাজপোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, দৃশ্যপট সব তোমরাই প্রস্তুত করবে। অভিনয় শেষে অভিনেতাদের সাফল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে শিক্ষকমহাশয়ের নেতৃত্বে আলোচনা কর।

(খ) সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসপুস্তক থেকে পরদেশী অভিযানের বিরুদ্ধে পুরু ও চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর।

৭। টীকা লেখ: সেকেন্দার, পুরু, চন্দ্রগুপ্ত।
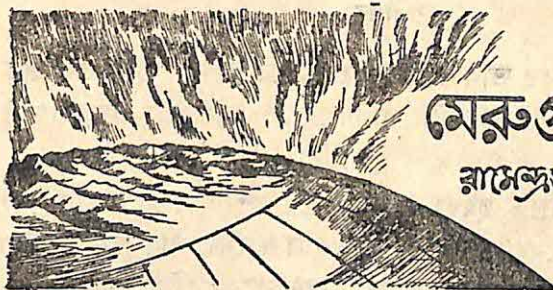
বাংলা ১৩০২ সনের 'মুকুল' পত্রিকা—আশ্বিন সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

ইংরাজদের দেশ আমাদের দেশের অনেক উত্তরে। সূর্য জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আমাদের মাথার উপরে আইসে। কিন্তু ইংরাজদের দেশে সূর্য কখনই মাথার উপর আসে না। কাজেই সেখানে সূর্যের তাপ কখনই আমাদের দেশের মত প্রখর হয় না। প্রকৃতপক্ষে যতই উত্তর মুখে যাওয়া যায়, সূর্যের তেজ ততই ক্ষীণ হইয়া আসে ; কারণ, সূর্য আর মাথার উপর আসে না। কাজেই শীতের ভাগটা ক্রমেই বাড়িয়া যায়।

মানচিত্রে দেখিতে পাইবে—এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা, তিন মহাদেশেরই উত্তর ভাগে সমুদ্র রহিয়াছে। এই সমুদ্রকে উত্তর মহাসাগর বলে। ঐ উত্তর মহাসাগরের অধিকাংশ ভাগটাকে মেরু-প্রদেশ বলে। মেরুপ্রদেশটায় মোটের উপর ভয়ংকর শীত।

মেরুপ্রদেশ নাম কেন হইল, তোমরা বোধ হয় জান। পৃথিবী প্রত্যহ আপনার শরীরটাকে ঘুরাইতেছে, শুনিয়া থাকিবে। একটা লেবুর অথবা বেলের বোঁটার কাছে ও মাথার কাছে আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া ঘুরাইতে থাকিলে, অথবা একটি মাটির ভাঁটা তৈয়ার করিয়া, তাহার ভিতর মাঝামাঝি একটা কাঠি চালাইয়া, সেই কাঠির দুই প্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইতে থাকিলে লেবু, বেল ও ভাঁটা যেমন ঘুরিতে থাকে, পৃথিবীর ঘোরাও কতকটা সেইরূপ। অবশ্য পৃথিবীতে এরূপ কোন কাঠি নাই অথবা পৃথিবীকে কোন ব্যক্তি ধরিয়া ঘুরায় না। পৃথিবী আপনি ঘুরিতেছে। বেল, লেবু ও ভাঁটা যখন ঘুরে তখন দেখিতে

পাইবে, উহার মাঝের ভাগটা যত দ্রুত ঘুরিতেছে, অন্য স্থান তত দ্রুত ঘুরিতে পায় না, এবং যেখানটা ধরা আছে সে জায়গাটা একেবারেই ঘুরিতে পায় না।

সেইরূপ পৃথিবীতে দুইটা স্থান আছে, তাহারা একেবারে ঘুরে না। সে দুইটা স্থানের নাম 'মেরু'। একটা স্থানের নাম সুমেরু, উহা উত্তর দিকে রহিয়াছে; অন্য স্থানের নাম কুমেরু, উহা দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে। কুমেরু ও সুমেরুর নিকটবর্তী স্থান ঘুরে, তবে মধ্যভাগের ন্যায় দ্রুতগতিতে ঘুরে না। সেই নিকটবর্তী প্রদেশকে মেরুপ্রদেশ বলে। আমরা যদি কলিকাতা কি বাঙ্গলা দেশের অন্য কোন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, পাহাড় পর্বত না মানিয়া বরাবর উত্তর মুখে চলি, তাহা হইলে উত্তর মেরুপ্রদেশে উপস্থিত হইতে হইবে, এবং অবশেষে সুমেরুতে উপস্থিত হইয়া আর উত্তর মুখে যাওয়া চলিবে না।

একবার এই সুমেরুতে কোন রকমে হাজির হইতে পারিলে নানা কৌতুকজনক ব্যাপার দেখা যাইতে পারে। আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই, আকাশে রাত্রিকালে নক্ষত্রগুলি পূর্ব দিকে উঠে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কিন্তু মেরুতে দাঁড়াইলে এরূপ উদয়-অস্ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সেখানে পূর্ব ও পশ্চিম নাই, উদয় অস্ত নাই। সমুদয় নক্ষত্রগুলি চিরকালই দেখা যাইবে—কোনটিরই অস্ত দেখিতে পাইবে না। ঠিক মাথার উপরে একটা স্থান ও একটা নক্ষত্র স্থির নিশ্চল বোধ হইবে। অন্য নক্ষত্রগুলো সেইটাকে মাঝখানে রাখিয়া তাহারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, এইরূপ বোধ হইবে। সমুদয় আকাশটা যেন সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। একটা ছাতা খুলিয়া মাথার উপরে ধরিয়া, তাহার বাঁট ধরিয়া ঘুরাইতে থাকিলে যেমন দেখায়, সমুদয় আকাশটাকে তেমনি দেখাইবে। বাঁশ পুঁতিয়া, তাহাতে ছোট-বড় অনেকগুলি দড়ি দিয়া কতকগুলি ভেড়া বাঁধিয়া দিয়া তাহাদিগকে একমুখে তাড়া দিলে যেমন তাহারা সেই বাঁশের চারিদিকে ঘুরে, নক্ষত্রগুলাকে সেইরূপে ঘুরিতে দেখা যাইবে।

সুমেরুতে সূর্যের উদয় অস্ত আরও কৌতুকজনক ব্যাপার। আমরা

সূর্যকে প্রত্যহ পূর্বদিকে উঠিতে ও পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখি। এইরূপ বৎসরে সূর্য ৩৬৫ বার উঠে ও ৩৬৫ বার অস্ত যায়। কিন্তু সুমেরুতে তাহা হয় না। সুমেরুতে ১০ই চৈত্র তারিখে ঠিক দক্ষিণ দিকে সূর্যের উদয় হয়। তার পর সূর্য আর অস্ত যায় না। সঙ্গে যদি ঘড়ি থাকে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কত চব্বিশ ঘণ্টা উপরি-উপরি কাটিয়া গেল, কিন্তু সূর্য আর অস্ত যাইতে চায় না, দিনও কোনমতে ফুরাইতে চায় না। সূর্য অস্ত না গিয়া আকাশের চারিদিকে পাক খায় ও একটু-একটু করিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে। গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের সিড়িঁতে যেমন পাক খাইতে খাইতে উঠা যায়, সূর্য কতকটা সেইরূপ আকাশের চারি ধারে পাক দিতে দিতে উপরে উঠে ; কিছু দূর উঠিয়া আবার সেইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে নামিয়া অস্ত যায়। সূর্য যখন অস্ত যাইবে তখন কিন্তু আর চৈত্র মাস নাই। পৃথিবীর অন্যত্র তখন ১০ই আশ্বিন উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ ১০ই চৈত্র তারিখে সূর্যের উদয় হইয়া ছয় মাস পরে ১০ই আশ্বিন তারিখে সূর্যের অস্ত ঘটিবে। এই ছয় মাস কাল ক্রমাগত সুমেরুতে 'দিন'। তার পর ১০ই আশ্বিন হইতে পুনরায় ১০ই চৈত্র পর্যন্ত আর সূর্য একেবারেই দেখা দিবে না। তখন সুমেরুতে 'রাত্রি'। ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত দিন ও ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত রাত্রি! মনে কর দেখি, এ কীরূপ ব্যাপার। আমাদের সংবৎসরের মধ্যে ৩৬৫-টা দিন ও ৩৬৫-টা রাত্রি ঘটে। কিন্তু সেখানে সারা বৎসর কেবল একটা দিন আর একটা রাত্রি।

আমাদের দেশে যখন ঘোরতর গ্রীষ্ম, সেই মেরুপ্রদেশের হাওয়া তখন বরফের মত ঠাণ্ডা। শীতকালের তো কথাই নাই। সুমেরুতে ছয় মাস ধরিয়া রাত্রি বলিয়াছি। সুমেরুর নিকটস্থ স্থানে ছয় মাস না হউক, দুই মাস, চারি মাস, পাঁচ মাস করিয়া রাত্রি থাকে। সেই রাত্রে সেই শীতে, সে প্রদেশের কী অবস্থা হয়, আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। সেখানে সমুদয় মহাসাগর সারা বৎসর বরফে আচ্ছন্ন থাকে। সমুদ্রের জল জমিয়া বরফে একাকার হইয়া রহিয়াছে। বরফেরই দেশ, বরফেরই পাহাড়। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় সেই বরফের পাহাড়ের

উপর স্থানে-স্থানে বরফ গলিয়া পুষ্করিণী ও হ্রদ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। আবার দেখিতে দেখিতে হয়ত সমুদয় পুষ্করিণী বা হ্রদ জমাট বাঁধিয়া যায়। আমি এ স্থলে ঠিক সুমেরুর কথা বলিতেছি না—সুমেরু হইতে তিন-চারি শত ক্রোশ দূরের কথা বলিতেছি। সেইখানে এইরূপ অবস্থা। জল জমিয়া যায় বলিয়া জাহাজ সমুদ্র দিয়া চলিতে পারে না। বরফের উপর দিয়া একরকম চাকাহীন গাড়িতে চড়িয়া পিচ্ছিল পথে চলিতে হয়। এক প্রকার হরিণ এই গাড়ি টানে। কোন গাছপালা ঘাস পর্যন্ত দেখা যায় না। কোন পরিচিত জন্তু দেখা যায় না। অপূর্ব সামুদ্রিক জলজন্তু বরফের উপর কখনও কখনও খেলা করিয়া বেড়ায়। উহাদিগকে মারিয়া অনেক সময়ে আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। লোকালয় নাই। যেখানে শীত অপেক্ষাকৃত কম সেখানে মানুষে কষ্টেসৃষ্টে শাদা ভালুক আর একরূপ হরিণ আর সামুদ্রিক সীল নামক প্রাণী তাড়াইয়া একরূপে জীবনধারণ করে। তাহাদেরই মাংস খায়, তাহাদেরই চামড়া গায়ে দেয় ও তাহাদেরই চর্বি জ্বালাইয়া আগুন তৈয়ার করে। সে সকল মানুষের অবস্থাও প্রায় জন্তুর মত। মাঝে মাঝে হয়ত বরফের পাহাড় ও বরফের মাঠ ফাটিয়া দুখান হইয়া মধ্যে সংকীর্ণ রাস্তা হয়, সেই রাস্তায় কোনরূপে জাহাজ চালান যাইতে পারে। হয়ত অকস্মাৎ জাহাজ সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় চারিদিকে বরফ জমিয়া গেল ও জাহাজের গতি একেবারে রুদ্ধ হইল। জাহাজ আট্‌কাইয়া গেল অথবা চারি দিকের বরফের ধাক্কায় জাহাজ ভাঙ্গিয়া পিষিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। আরোহীরা যে কোথায় গেল, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

এইরূপে কত বার কত জনে জাহাজ লইয়া সুমেরুর অভিমুখে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। কত বার তাঁহারা অকূল বরফের মাঝে হারাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ঠিক পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। একবার ফ্রাংকলিন নামক একজন সাহেব কতকগুলি সঙ্গী লইয়া এইরূপ মেরুপ্রদেশ দেখিতে গিয়া হারাইয়া যান। দশ-পনের বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের সন্ধানার্থ কত লোকে আবার সেই ভয়াবহ প্রদেশে

যাত্রা করে। তাঁহার আত্মীয় স্বজন কত বৎসর ধরিয়া আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু হায়, অবশেষে কেবল তাঁহাদের হাতের লেখা কাগজপত্র ও জিনিসপত্র ভিন্ন আর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। এত যত্ন ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এখনও সুমেরু হইতে দুইশত ক্রোশের ভিতরে মানুষ এ পর্যন্ত যাইতে পারে নাই। এই দুইশত ক্রোশ অতিক্রম করিবার কোন ভরসা বা উপায় দেখা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় জাতির অধ্যবসায় দমনে রাখিবার নহে। বেলুনে চড়িয়া আকাশমার্গে সুমেরু যাত্রার প্রস্তাব উঠিয়াছে।

মেরুপ্রদেশে যখন সুদীর্ঘ রাত্রি, যখন দুই মাস চারি মাস ধরিয়া নিবিড় আঁধারে চারি দিক আবৃত থাকে, তখন মধ্যে মধ্যে আকাশে এক অপূর্ব আলোক দেখা যায়। দেখিতে দেখিতে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধনুর আকারে যেন জ্বলিয়া উঠে এবং সেই আলোকের ধনু হইতে কিরণরাশি ঊর্ধ্ব মুখে মাথার উপর দিয়া চলিতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে তাহাতে নানাবিধ বিচিত্র রং দেখা যায় তাহার বড় শোভা। আবার দেখিতে দেখিতে কিছু কাল পরে সমুদয় অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। এই অদ্ভুত আলোকের ইংরাজী নাম 'অরোরা'। মেরু হইতে দূরবর্তী স্থানে—সুইডেন, নরওয়ে, আমেরিকার উত্তরভাগ, এমনকি স্কটলণ্ডেও সচরাচর এই প্রত্যক্ষ হয়। ইহাতে আকাশের শোভা জন্মে বটে, কিন্তু ইহার মৃদু চঞ্চল আলোকে মানুষের কোনও কাজ হয় না।

॥ অনুশীলনী ॥

১। কোন্ অঞ্চলকে মেরুপ্রদেশ বলে?

২। মনে কর, তুমি সুমেরুতে হাজির হয়েছ। সেখানে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রগুলিকে কীরকম দেখতে পাবে?

৩। সুমেরুতে ছয় মাস ধরে ক্রমাগত দিন এবং ছয় মাস ধরে ক্রমাগত রাত্রি —এরকম কেন হয়?

৪। শীতকালের মেরুপ্রদেশের অবস্থা বর্ণনা কর।

৫। মেরুপ্রদেশে পৌঁছবার জন্য মানুষের বারংবার চেষ্টার ফল কী হয়েছে ?

৬। টীকা লেখো :

স্থমেরু, অরোরা।

৭। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো :

কৌতুকজনক, নিশ্চল, অন্যত্র, ক্রমাগত, লোকালয়, অধ্যবসায়।

৮। **কর্মশিক্ষা** ॥ 'উত্তরমেরু অভিযান' এবং 'দক্ষিণমেরু অভিযান'—এই দুটি বিষয়ে কর্মপ্রকল্প গ্রহণ কর। বিভিন্ন দলের নাম দাও আমুণ্ডসেন, পিয়ারী, স্কট, ন্যান্‌সেন প্রমুখ অভিযাত্রীদের নামে। তাঁদের দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে বইপত্র থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ কর, ছবি আঁক, চার্ট তৈরি কর। কাগজের মণ্ড থেকে একটি গ্লোব তৈরি কর এবং তাতে বিভিন্ন দেশ, মহাসাগর, বিষুবরেখা ইত্যাদির অবস্থান আঁক।

৯। নিম্নোদ্ধৃত সাধুভাষায় লিখিত অনুচ্ছেদটি চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে লেখো :

মেরুপ্রদেশে যখন সুদীর্ঘ……কাজ হয় না। (শেষ অনুচ্ছেদ)
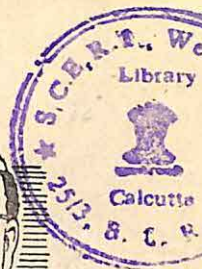
তরুণের সাধনা

সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীহট্ট ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশনের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের লিখিত অভিভাষণ থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল—তরুণ ছাত্রসমাজ তাদের পথনির্দেশ খুঁজে পাবে এই লেখায়।

কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। টাটকা রাঙা ফুলেই দেবীর আরাধনা হইয়া থাকে, পুরানো বাসি ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে না। তাই বলি, হে আমার তরুণ ভাই সব, তোমাদের হৃদয় যখন পবিত্র, শক্তি যখন অফুরন্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন যখন আশার রক্তিম রাগে রঞ্জিত, সেই শুভ সময়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের চরণে আত্মোৎসর্গ কর।

সে আদর্শ কী—যাহার প্রেরণায় মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, বিপুল আনন্দের আস্বাদ পায়, অসীম শক্তির পরিচয় পায়? সে আদর্শ কী—যাহার পুণ্যপরশে দেশে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে? তোমরা হয়তো মনে কর যে মহাপুরুষেরা বড় হইয়াই জন্মায়, তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া বা সাধনা করিয়া বড় হইতে হয় না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর, তাহা হইলে দেখিবে যে প্রত্যেকের জীবনে আছে অসীম অধ্যবসায়, অক্লান্ত চেষ্টা, গভীর সাধনা ও অবিরত পরিশ্রম। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অসীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সে ভস্মরাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোটী সূর্যের উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হইয়া মনুষ্যসমাজকে মুগ্ধ করিবে।

দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত। দান করিবার মত সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই। শরীরে যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, শিক্ষাদীক্ষা যে পাইয়াছে,—সে ব্যক্তির দিবার মত সম্বল আছে। যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীন হীন, তাহার দানের কোনও অর্থ নাই; সে নিজেই কৃপার পাত্র। ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে।

ইংরাজ—তথা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত উন্নতি করিয়াছে তাহার কারণ, তাহাদের দুইটি অপূর্ব গুণ আছে যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে, এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের spirit of adventure আছে। নূতনের আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে। বাহিরের টানে তাহারা ঘর ছাড়িতে পারে, সংসারের আকর্ষণে তাহারা চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জন করিতে পারে। এই নির্ভীকতা, গতিশীলতা ও 'সুদূরের পিয়াস' আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ এত উন্নত; ইহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হীন ও পঙ্গু।

কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও একদিন উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, জ্ঞানালোক বিকীরণ করিয়াছি এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছি। সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্মবিকাশের যুগ, উত্থানের যুগ। তারপর আসিল সঙ্কোচনের যুগ, আত্মসুপ্তির যুগ, পতনের যুগ। আজকাল আবার জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি, পতনের পর আবার উত্থান আরম্ভ হইয়াছে; তাই সুপ্তিভঙ্গের ও নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণ চারিদিকে ফুটিয়া

উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসুপ্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে সম্পদ্ যাহা কিছু আছে, বিশ্বদরবারে নিবেদন করিবার জন্য আমরা পাগল হইয়াছি।

ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দুর্দশা সত্ত্বেও আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্মী, আম্যাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তিগীর পালোয়ান—পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা বার বার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

কিন্তু আমরা জাতি হিসাবে এখনও অধঃপতিত। জনসাধারণকে আমরা যেদিন শিক্ষার দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব সেদিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনও জাতি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। প্রকৃত দেশাত্মবোধ যেদিন আমাদের মধ্যে জাগিবে সেদিন আমরা জনসাধারণের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারিব। মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণবিচূর্ণ করা। স্কুলে-কলেজে ঘরে-বাহিরে পথে-ঘাটে-মাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে, সেখানে বীরের মত অগ্রসর হইয়া বাধা দাও—মুহূর্তের মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, চিরকালের জন্য জীবনের স্রোত সত্যের দিকে ফিরিয়া যাইবে—সমস্ত জীবনটাই রূপান্তরিত হইবে। আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত'—কোন্ সাধনা? এই সাধনার প্রকৃত স্থান রূপে ছাত্রজীবনকেই শ্রেষ্ঠ মনে করার কারণ কী?

২। জাতি হিসাবে বর্তমানে ভারতবাসীর এত অবনতি ঘটেছে কেন? সুভাষচন্দ্র এই অধঃপতনের কারণগুলি কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন? অধঃপতন রোধের জন্য সুভাষচন্দ্র তরুণসমাজের সামনে কী প্রস্তাব রেখেছেন?

৩। সরল ভাষায় বুঝিয়ে দাও:

(ক) টাট্‌কা রাঙা ফুলেই……পারে না।

(খ) সাধনার দ্বারা সে ভস্মরাশি……মুগ্ধ করিবে।

(গ) যে ভিক্ষুক……নিজেই কৃপার পাত্র।

(ঘ) বাহিরের টানে……বর্জন করিতে পারে।

(ঙ) মনুষ্যত্ব লাভের……অন্তরায় চূর্ণবিচূর্ণ করা।

৪। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো:

প্রকৃষ্ট, রক্তিম, আত্মোৎসর্গ, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, অপনীত, গতানুগতিক, পঙ্গু, তরঙ্গমালাসঙ্কুল, উপনিবেশ, বিকীরণ, সম্প্রসারণ, সঙ্কোচন, আত্মতৃপ্তি, স্পন্দন, উৎসুক, আন্তর্জাতিক, প্রতিপন্ন, দেশাত্মবোধ, রূপান্তরিত।

৫। **কর্মশিক্ষা** ॥ (ক) 'দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র' শীর্ষক একটি কর্মপ্রকল্প গ্রহণ কর। শিক্ষকমশায়ের সহযোগিতায় পরিকল্পনা রচনা কর; স্বাধীনতা সংগ্রামে, জাতীয় জাগরণে সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বল অবদান সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ কর, চার্ট তৈরি কর, প্রদর্শনীর আয়োজন কর।

(খ) 'আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতবাসী'—এই নামে একটি কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা রচনা কর। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজসেবা, ব্যবসা-সংগঠন, যুদ্ধ, খেলাধুলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর, চার্ট তৈরি কর, প্রদর্শনী সাজাও।

(গ) কলকাতার লালা লাজপত রায় রোডে অবস্থিত 'নেতাজী মিউজিয়ম' দেখে এস।

শকুনির ডিম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের ছায়াভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। তার নাম অপু। কণ্ঠে তার পথের পাঁচালী-গান, চোখে তার স্বপ্ন অজানা-অসম্ভবের দেশের—শকুনির ডিম মুখে পুরে নিয়ে কবে সে আকাশে উড়ে বেড়াবে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অন্তর্গত এ অংশটি।

অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—তাহার দিদিকেও না। সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ঐ বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যের একখানা বইয়ের মধ্যেই এই অদ্ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে!

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইয়ের বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বইয়ের মধ্যে ভালগল্প লেখা আছে কি না, দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কী, বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজকাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুইচোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো গন্ধ!

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন—

শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—আবার পড়িল, আবার পড়িল। পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি ?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে, সে এখানে নয় ; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস্! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য ! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না ? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ি নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো-পুরানো গন্ধটা ! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা, সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, উহা যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায় ?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক-একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন্ অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠা পাতের ভাত লইয়া বাড়ির খিড়কিদোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো—তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি-হাসি মুখে চুপ করিয়া থাকে, যেন কী অপূর্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের

চোখের সামনে খুলিয়া যায়। হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে—ওই এসেচে! কোত্থেকে এল দেখ্‌লি—খুশিতে সে হি-হি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারী। তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে; আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে; মনে মনে ভাবে—আজ ভুলো আসবে না বোধহয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে! আজ কি আর শুনতে পেয়েছে!

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়িয়া-খুড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির! অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়। বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায়। মনে মনে ভাবে—ঠিক শুনতে পায় তো, আসে কোত্থেকে!

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কী আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না—শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁটালতলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস্‌, শকুনির বাসা দেখতে পাস্‌? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেব।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ির সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুটো কালো রঙের ছোট ছোট

ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই ছাখো ঠাকুর, এনিচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল—দেখি। পরে আহ্লাদের সহিত উল্টাইতে পাল্টাইতে বলিল—শকুনির ডিম! ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন্ উঁচু গাছের মগ্‌ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না। অনেক দর-দস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া-চিন্তিয়া দুটা পয়সা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুইটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলো অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অন্য সময়, কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুনবীচি খেলা!

ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মন যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মত হাল্কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পোঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না। সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেড়াদের জামগাছের কাটা-গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে, সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখ পাখি ময়না পাখির মত ও ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?···

সেইদিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকে হাঁড়ি-কলসির পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেড়া-খোড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে কী যেন ঠক্ করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা, কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে! এঃ, পড়ে একেবারে গুড়ো হয়ে গিয়েচে—দেখেচো, কী পাখি ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কী ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না...কান্না...হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কী কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনো শুনিনি—শুনেচো সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে। ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা, তাকে বুঝি বলেচে, সে কোথেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে—এই নেও শকুনের ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কী বোকা, সে আর তোমার কাছে কী বলবো, সেজ ঠাকুরঝি—কী করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি!

কিন্তু বেচারী সর্বজয়া কী করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না। আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত!

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা'—(ক) কোন্ বইখানি? (খ) পাঠক কে? (গ) বইখানি সে কীভাবে হাতে পেয়েছিল? (ঘ) অদ্ভুত কথাটা কী? (ঙ) কথাটা জানবার পর তার মনে কী ইচ্ছা জেগেছিল? (চ) সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য সে কী করেছিল? (ছ) পরিণামে কী দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

২। 'তাহার পর কী ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো'—কীসের পর? পরে কী ঘটেছিল?

৩। 'ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই'—অপুর চোখে মেয়েলি ব্যাপার কোন্‌টি? অপুর পছন্দ কীসে?

৪। অর্থ বুঝিয়ে দাও: (ক) যেন কী অপূর্ব......সামনে খুলিয়া যায়।

(খ) আকাশে উড়িবার আমোদের......বেগুনবীচি খেলা!

৫। **কর্মশিক্ষা**॥ ইস্কুলে একটি 'প্রকৃতিকোণ' গড়ে তোলো। সেখানে পাখির ডিম, ঝিনুক, নানারকম পাখির বাসা ও পালক সংগ্রহ করে জমা কর।

জননী সারদামণি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'আমি সতের-ও মা, অসতের-ও মা'—বলেছিলেন সারদা দেবী। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পত্নী সারদামণি এক আশ্চর্য মহীয়সী নারী। তাঁরই চরিত্রমাধুর্য ধরা পড়েছে নাট্যকার গিরিশ ঘোষের চোখে। লেখকের 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে সংকলিত এই অংশটি সারদা দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

'আমাকে কে ছুঁল?' যীশুখৃস্ট পিটারকে জিজ্ঞেস করলেন।

'এই অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যে তা কি কিছু ঠিক করে বলা যায়?' বললে পিটার।

'আমোদ দেখতে অনেকে ধাক্কা মেরেছে, কিন্তু ভক্তিভরে ছুঁয়েছে শুধু এই একজন। তোমাকে বলছি,' বললেন যীশু, 'তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।'

সেই একজন সামান্য এক স্ত্রীলোক। কঠিন রোগে ভুগছে। মনে বিশ্বাস, যীশুকে ছুঁলেই তার রোগ সেরে যাবে। তাই ভিড়ের মধ্যে সেও এসেছিল, হাত বাড়িয়েছিল। তা, সে তো যীশুর বস্ত্রপ্রান্ত মাত্র ছুঁয়েছে। তাই তিনি টের পেয়েছেন।

ছুঁতেও হয় না হয়ত। শুধু স্মরণ করলেও বোঝেন ঠিক ঠিক। সন্দেহ কী, সেই রুগ্ন স্ত্রীলোক ভালো হয়ে গেল।

এই উপাখ্যানটা শুনছিল গিরিশ। জ্বলন্ত কণ্ঠে গর্জন করে উঠল: 'ঠিক কথা। হাজার হাজার লোক আমোদের জন্যে যায়, একজন কি

তুজন দেখবার জন্যে যায়। খুদিরাম চাটুজ্জের ব্যাটা গদাই চাটুজ্জেকে হাজার হাজার লোক দেখেছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ক'টা লোক দেখেছিল ?'

* * *

গিরিশের ইচ্ছে হল তার বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় মা-ঠাকরুন উপস্থিত থাকেন। সারদানন্দকে দিয়ে জয়রামবাটীতে চিঠি লেখাল। মা, তোমার আসা চাই—তুমি না এলে গিরিশের পূজাই এবার অর্থহীন।

কিন্তু মা কী করে আসেন ? ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে তাঁর শরীর ভীষণ কাহিল হয়ে গেছে। 'মা যদি না আসেন', বললে গিরিশ, 'তা হলে পুজো বন্ধ করে দেব। কোনদিনই আর পুজো করব না। মা ছাড়া আর ভগবতী কে।'

গাঁয়ের চৌকিদার অম্বিকা বাগদি বলেছিল, লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী, কত কী বলে, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।' মা বললেন, 'তোমার বোঝবার দরকার নেই। তুমি আমার অম্বিকে দাদা, আমি তোমার সারদা বোন।'

জয়রামবাটীতে মায়ের যখন মন্দির নির্মাণ হচ্ছে, বৃদ্ধা গয়লা-মা বললে, 'সারি বামনি, তার আবার মন্দির! এই সেদিনও তার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি।' আরো বললে : 'তোমরা তাকে ভগবতী বলো, কিন্তু আমরা জানি, আমাদের গাঁয়ের ঝিউড়ি সারু, আমাদের ঠাকুরঝি। বাসন মাজত, কাপড় কাচত, ঢেঁকিতে পাড় দিত, মুনিষদের খেতে দিত। ঠিক আমাদেরি মত। তখন কি বুঝেছি গা ? শিষ্যসেবক আসত, কত জিনিস দিত, কত টাকা পড়ত পায়ের কাছে। মনে করতাম—বামনি, বড়-বড় শিষ্যসেবক, তাই অত দিচ্ছে। বলেছিলাম একদিন, ঠাকুরঝি, ভায়েদের পিছনে খরচ না করে গাঁয়ে তিন দিন অষ্টপহর দাও। আমার কথা শুনে হেসে ফেলল ঠাকুরঝি, বললে, কত অষ্টপহর দেখবি পরে! অত বুঝিনি তখন, এখন বুঝছি। মহামায়া মায়ায় আমাদের চোখ ঢেকে রেখেছিল। তাই ভাবি, বেঁচে থাকতে

যে আমাদের ভাত-কাপড় দিয়েছিল, মরলে সে কি পায়ে জায়গা দিবেনি ?'

মা এলেন। উঠলেন বলরাম বোসের বাড়িতে। গিরিশের বাড়ি কাছেই, খবর শুনে দিদি দক্ষিণাকে নিয়ে গিরিশ গেল মাকে প্রণাম করতে। দক্ষিণা বললে, 'গিরিশ তো বেঁকে বসেছিল, মা। বললে, মা না এলে পুজো করব কাকে নিয়ে ? পুজো এবার বাদ যাবে।'

মা সস্নেহে হাসলেন ! পুজো কি বাদ যেতে পারে ? কত বড় বীর ভক্ত গিরিশ, তার ডাক কি উপেক্ষা করতে পারি ?

মা-র সামনেই কল্পারম্ভ হল। কিন্তু মা ক'জায়গা সামলাবেন ? সপ্তমীর ভোর থেকেই বলরামের বাড়িতে ভিড়, দলে-দলে লোক এসে মা-র পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে আর প্রণাম করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থেকে এই পূজা-প্রণাম গ্রহণ করলেন মা। তারপর বেলা প্রায় এগারোটায় গিরিশের বাড়ি থেকে ডাক এল। সেখানে প্রতিমার পূজা। কিন্তু পরমাকে পেয়ে ভক্তের দল ছাড়বে কেন ? প্রতিমার পাশে পরমা দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। দেবীর দুই মূর্তির পদতলেই পুজাঞ্জলি পড়তে লাগল। সকলেরই পূজা-প্রণাম স্বীকার করলেন মা, কাউকে বিমুখ করলেন না।

মহাষ্টমীর দিন আরো ভিড়, আরো অসহনীয় অবস্থা। শরীর অসুস্থ, তবু মা চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়ালেন। দু'জায়গাতেই—বলরামের বাড়ি, আবার গিরিশের বাড়ি। বলরামের বাড়িতে একাকিনী, গিরিশের বাড়িতে প্রতিমা-প্রতিরূপিণী।

দুর্বল শরীরে কত আর সইবে ? মা-র ঠিক জ্বর এসে গেল। গভীর রাতে সন্ধিপূজা—স্থির হল, সন্ধিপূজায় মা আর উপস্থিত হবেন না।

গিরিশ আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু উপায় কী ! অসুখের উপর কথা নেই।

অভিমানে গিরিশ আর গেল না মণ্ডপে। শোকার্তমুখে নীরবে বসে রইল।

মধ্যরাত্রে খিড়কির দরজায় মৃদু করাঘাত পড়ল। কে জানে কে! ঝি খুলে দিল দরজা।

'আমি এসেছি!'

ওরে মা এসেছেন, মা এসেছেন! গিরিশ আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, 'ভেবেছিলুম আমার পূজোই হল না। এমন সময় দরজায় ঘা দিয়ে বললেন, আমি এসেছি। ওরে মা কি সন্তানের ডাকে না এসে পারে?'

।। অনুশীলনী ।।

১। যীশুখৃস্ট ও রুগ্ন স্ত্রীলোকের উপাখ্যানটি বল। খৃস্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে গিরিশ কোথায় মিল খুঁজে পেয়েছিলেন?

২। গিরিশ ঘোষ, অম্বিকা বাগদি, গয়লা-মা—এঁদের চোখে সারদাদেবীর মহত্ব কীভাবে ধরা পড়েছে, লেখো।

৩। অর্থ বুঝিয়ে দাও : (ক) আমোদ দেখতে……এই একজন।

(খ) প্রতিমার পাশে পরমা……পূজাঞ্জলি পড়তে লাগল।

৪। টীকা লেখো : যীশুখৃস্ট, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

৫। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো :

মনোবাঞ্ছা, উপাখ্যান, ঝিউড়ি, মহামায়া, কল্পারম্ভ, পরমা।

৬। **কর্মশিক্ষা** ।। (ক) 'মহৎ জীবন' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ কর। যীশুখৃস্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও মানবপ্রেম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর, ছবি আঁক, চার্ট ও মাটির মডেল তৈরি কর।

(খ 'জননী সারদামণি' নামে একটি নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা কর। মঞ্চনির্মাণ, সাজসজ্জা, ব্যবস্থাপনার সব দায়িত্ব তোমাদের।

(গ) শিক্ষকমশায়ের নেতৃত্বে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, জয়রামবাটী ও কামারপুকুর-তীর্থ দর্শন করে এস।

শব্দের জগতে

কুঞ্জবিহারী পাল
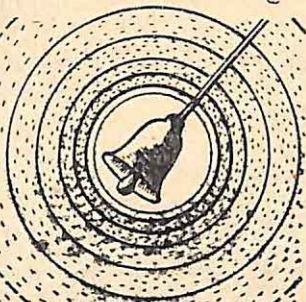
এ দুনিয়ায় যা কিছু দেখি বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি, তা হয় বস্তু, নয় শক্তি। শক্তি আর বস্তু নিয়েই মানুষের কাজ কারবার। বস্তু বা পদার্থকে আশ্রয় করেই শক্তির প্রকাশ। আলো, উত্তাপ—এরা শক্তি—এনার্জি। আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য বুঝি আমাদের চোখ দিয়ে, শব্দ শুনি আমরা কান দিয়ে। বিজ্ঞানের জগতে শব্দের কত রহস্য।

বেলা বাড়ছে। কর্মচাঞ্চল্য বাড়ছে মানুষের। চারদিকে শুধু শব্দ আর শব্দ। না বাপু, এ আর ভাল লাগে না। চুপচাপ কোথাও গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে এলে হয়। তা, যাও না কোন পাহাড়ের দেশে। সেখানে গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ নেই, জনকোলাহল নেই। কিন্তু সেখানে তুমি শুনতে পাবে পাতার মর্মর শব্দ, পাখির মিষ্টি গান, ঝরনার কুলু কুলু ধ্বনি।

শব্দ নেই—এরকম অবস্থা কল্পনা করতে পার? সাহিত্যে হয়ত বিবরণ পড়া যায়—নীরব নিস্তব্ধ প্রান্তরের। অনেকের অভিজ্ঞতাও হয়ত আছে এরকম অবস্থার। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায়, একদম শব্দ নেই, এরকম অবস্থা কল্পনা করাই যায় না। এই যে চারিদিকে এত শব্দ, এসব শুনে একবারও ভেবেছ কি, কী করে তৈরি হয় শব্দ, কী করে তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করে, কেন কোন শব্দ মধুর, কোন শব্দ কর্কশ?

অনেক—অনেক দিন আগেকার কথা। ব্যাবিলন শহরে একটা

খুব উঁচু স্তম্ভ তৈরি হচ্ছিল। স্তম্ভটা হবে এত উঁচু যে তার মাথাটা গিয়ে ঠেকবে একেবারে স্বর্গের গায়ে। এতে করে পৃথিবীর লোকের ভারি সুবিধে হবে। স্বর্গে যাবার জন্যে আর তাদের কোন মেহনত করতে হবে না। স্তম্ভের সিঁড়ি বেয়ে তারা অনায়াসেই স্বর্গে গিয়ে হাজির হতে পারবে। এদিকে ভগবান পড়লেন মহা চিন্তায়। স্বর্গে আসার জন্যে পৃথিবীর লোকেরা যদিও বা তাঁর একটু আধটু পূজো অর্চনা করত, এবার বুঝি তাও থাকে না। তাই তিনি একটা বুদ্ধি বাত্‌লালেন। তিনি এমন এক ব্যবস্থা করলেন যার ফলে যে-মিস্ত্রিরা স্তম্ভের কাজ করছিল তারা একজনের কথা অন্য জনে বুঝতে পারল না। কারোর কথা কেউ না বুঝলে তারা কাজ করবে কী করে? ফলে স্তম্ভ বানানোর কাজ মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল। ভগবানও সেবারকার মত রেহাই পেলেন।

গল্পটি গল্পই। কিন্তু এর মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে।

শব্দ আসলে কী? আমরা কান দিয়ে যা শুনি তা-ই শব্দ। শব্দেরও শক্তি আছে—সে কাজ করতে পারে। আকাশে মেঘ ডাকলে অনেক সময় ঘরের জানলা দরজা কাঁপে। কাছাকাছি জোর শব্দ হলে কানে তালা লাগে।

শব্দ সৃষ্টি হয় কী করে? আমরা যখন কথা বলি তখন বায়ুর মধ্যে এক ধরনের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। আমাদের জিভ আর ঠোঁটই এ কাজটি করে থাকে। পুকুরের জলে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে ব্যাপারটা কী ঘটে লক্ষ্য করেছ কখনো? দেখবে যেখানে ঢিলটা পড়েছে সেখানে গোল আকারের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে। ঢেউয়ের আকার ক্রমে বেড়ে চলল। ক্রমে তা পুকুরের সমস্ত জলে ছড়িয়ে পড়ল। বায়ুর মধ্যে যখন কোন আলোড়নের সৃষ্টি হয় তখন অনেকটা ঐ ধরনেরই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই ঢেউগুলো যখন কারো কানে গিয়ে পৌছয় তখন আমরা একটা শব্দ শুনতে পাই।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, বায়ু বা অন্য কোন মাধ্যমের

সাহায্যেই শব্দের ঢেউ তৈরি হয়, তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বিজ্ঞানের ভাষায়, একটি মাধ্যমের প্রয়োজন শব্দকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। মাধ্যমটি যদি কঠিন হয়, বা তরল হয়, তাতেও শব্দ ছড়িয়ে পড়ার কোন অসুবিধে হয় না।

কোন মাধ্যম ছাড়া শব্দ ছড়িয়ে পড়ে না। একটি সহজ পরীক্ষা দিয়ে এটা দেখানো যায়। একটা আবদ্ধ জায়গায় একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা নেওয়া হল। বাইরে থেকে সুইচ টিপে ঘণ্টাটি বাজানো হল। শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে। এবারে আবদ্ধ জায়গা থেকে সমস্ত বায়ু সরিয়ে দাও পাম্প করে। দেখবে ঘণ্টাটি নড়ছে, তবে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আবার বায়ু ভরে দাও আবদ্ধ জায়গার ভিতরে, দেখবে, ঘণ্টার শব্দ আবার শোনা যাচ্ছে।

বায়ুর মধ্যে শব্দের ঢেউ কী করে তৈরি হয় জান? যে-কোন জিনিসে যদি ঘা দেওয়া যায় তবে তা কাঁপতে থাকে। বায়ুর মধ্যে কোন জিনিস কাঁপতে থাকলে বায়ুতে চাপের তারতম্য হয়। ফলে সৃষ্টি হয় অসংখ্য ঢেউয়ের। এরাই ছুটে চলে বায়ুর মধ্য দিয়ে। আমরা শুনি শব্দ।

ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে—যখনই কোন জিনিস কাঁপে তখনই সৃষ্টি হয় শব্দ। হাতে একখানা কঞ্চি নিয়ে বায়ুর মধ্যে সেখানা আন্দোলিত করেই দেখ না কোন শব্দ শোনা যায় কি না! কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। এবারে কঞ্চিখানা বেশ জোরে দোলাতে থাক। দেখবে সপাং করে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রথমবারেও কঞ্চিখানা কেঁপেছে, দ্বিতীয়বারেও তাই। তবে? এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? কারণটা হল কম্পনসংখ্যা। প্রথমবারে কঞ্চিটা আস্তে আস্তে কেঁপেছে, দ্বিতীয়বারে দ্রুত তালে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে কম-সে কম সাতাশ-বার কাঁপলে তবেই শোনবার মত শব্দ সৃষ্টি হয়। কম্পনসংখ্যা বেড়ে বেড়ে যদি সেকেণ্ডে বিশ হাজার বারের উপরে ওঠে তবে যে-শব্দ তৈরি হয় তা আমরা

শুনতে পাই না। ঐ জাতীয় শব্দকে বলে সুপারসোনিক শব্দ। বাংলায় তাকে 'শব্দহীন শব্দ' বলতে পারি আমরা।

কোন আয়নার গায়ে আলো পড়লে তা প্রতিফলিত হয়। আমরা পাই প্রতিবিম্ব। ঠিক তেমনি কোন দেয়াল বা দূরের গাছপালার গা থেকেও শব্দ প্রতিফলিত হয় প্রতিফলিত শব্দকে আমরা বলি প্রতিধ্বনি বা 'একো'। এমনও হতে পারে যে, শব্দ একবার, দুবার বা তারও বেশিবার প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে একবার শব্দ করলে তার অনেকগুলো প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তোমাদের মধ্যে অনেকে আগ্রার তাজমহল, ফোর্ট প্রভৃতি দেখে থাকবে। নিশ্চয়ই জান যে, এসব জায়গায় কোন-কোন প্রাসাদ এমনভাবে তৈরি যে চেঁচিয়ে কিছু বললে সে শব্দ মিলিয়ে যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। গাইড এটা হাতে কলমে দেখিয়ে দেন।

শব্দের প্রতিধ্বনি সৃষ্টির ব্যাপারটা আবার বিজ্ঞানীরা নানা কাজে লাগিয়েছেন। সমুদ্রে জাহাজ চলবার সময় হয়ত কুয়াশায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। জাহাজ চালানোর বিপদ অনেক, সার্চলাইটে কিছুই দেখা যায় না। কোথায় কোন্ বরফের পাহাড়ে ধাক্কা লাগবে জাহাজের, কে বলতে পারে! কোন জাহাজ এরকম অবস্থায় পড়লে জাহাজের 'ফগ হর্ন' বাজানো হয়। 'ফগ হর্ন' হল এমন একরকম হর্ন যা জাহাজ কুয়াশায় আটকা পড়লেই বাজানো হয়। সে শব্দ দূরের কোন বরফের পাহাড় থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে আবার জাহাজে। শব্দের যাতায়াতে কতটুকু সময় লেগেছে, তা থেকেই হিসেব করে নেওয়া হয় পাহাড়টা কতদূরে আছে। জাহাজের ক্যাপ্টেনও সেই অনুসারেই সাবধান হতে পারে।

সমুদ্রের গভীরতা মাপবার জন্যেও প্রতিফলিত শব্দ কাজে লাগানো হয়। এক বিশেষ কম্পনবিশিষ্ট শব্দ তৈরি করে তা জলের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়। সে শব্দ সমুদ্রের তলা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। ফিরে আসতে সময় কতটা লাগে তা থেকে হিসেব করে বের করতে হয় সমুদ্রের তলাটা কতদূরে আছে।

তবে, প্রতিধ্বনি আমাদের নানাভাবেই বিরক্তির উদ্রেক করে থাকে। বক্তৃতা, গান প্রভৃতি করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে-সব ঘরে গান বা বক্তৃতা হচ্ছে সেখানে ঘরের দেয়াল থেকে শব্দ প্রতিফলিত হয়ে আসল শব্দকে ভাল করে শুনতেই দেয় না। অনেক সিনেমা, থিয়েটার-গৃহেরও এ দোষ দেখা যায়। সেজন্যে আজকাল থিয়েটার বা সিনেমা-গৃহের দেয়াল শব্দকে যাতে শুষে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়ে বিরক্ত করতে পারে না। সাধারণ ইটের দেয়ালের সামনে অ্যাসবেস্টসের দেয়াল বসিয়ে দিলেই এ কাজটি চলতে পারে ভালভাবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। শব্দের স্বরূপ কী? শব্দ সৃষ্টি হয় কী করে?

২। 'যখনই কোন জিনিস কাঁপে তখনই সৃষ্টি হয় শব্দ'—কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে উক্তিটিকে বোঝাও।

৩। শব্দের প্রতিধ্বনি সৃষ্টির ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও।

৪। অর্থ বুঝিয়ে দাও: ভগবানও সেবারকার মত রেহাই পেলেন।

৫। টীকা লেখো: ব্যাবিলনের সিঁড়ি, শব্দহীন শব্দ, প্রতিধ্বনি, ফগ হর্ন।

৬। বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো:
আলোড়ন, তারতম্য, প্রতিফলিত, উদ্রেক।

৭। **কর্মশিক্ষা** ॥ (ক) আগ্রার তাজমহল ও ফোর্ট, হুগলির ইমামবড়া, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইত্যাদি কখনও দেখতে গেলে প্রতিধ্বনির ব্যাপারটা নিজে পরীক্ষা করে দেখো।

(খ) বিদ্যালয়ে একটি কর্মপ্রকল্প গ্রহণ কর, নাম দাও: 'বিজ্ঞান-মেলা'। বিজ্ঞানমূলক নানা ছবি, চার্ট, মডেল ও সংগ্রহবস্তু এই মেলায় দেখাবার ব্যবস্থা কর—তোমাদের বিজ্ঞানশিক্ষকের পরিচালনায়।

৮। পদ পরিবর্তন কর: চাঞ্চল্য, পাহাড়, বিজ্ঞান, কল্পনা, মধুর, শহর, মেঘ, বায়ু, পরীক্ষা, প্রতিফলিত, উদ্রেক।

তুষারকিরীট হিমালয় পর্বতমালা, বর্ণের উজ্জ্বলতায় রোমাঞ্চকর নয়নাভিরাম রূপ। চড়াই-উৎরাই পথ, নীচে পর্বতের সানুদেশে ছবির মতো ক্ষুদ্র এক-একখানি পাহাড়ি গাঁও। কোথাও কোথাও সামান্য চাষ-আবাদ। পথের বিপদ তুচ্ছ করে আরও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে লেখক এগিয়ে চলেছেন কেদারনাথ-মন্দিরের উদ্দেশ্যে। সেই নির্ভীক পদযাত্রার কাহিনী লেখকের 'মহাপ্রস্থানের পথে' নামক ভ্রমণ-স্মৃতিচারণ থেকে তুলে দেওয়া হল।

আকাশ ঘন মেঘ ও কুয়াশায় প্রায় অন্ধকার! শোনা গেল, বৎসরে কোনো কোনোদিন মাত্র এ-রাজ্যে সূর্যকিরণ দেখা যায়! সম্মুখে সাদা তুষারময় পর্বতের কোলে-কোলে মেঘ ভেসে চলেচে। ঠাণ্ডায় পা ঠিক পড়চে না, মাতালের মতো ছন্দহীন হয়ে চলেচি। দাঁতের উপর দাঁত চেপে জমাট বেঁধে যাচ্চে। ইচ্ছা করচে ছুটোছুটি করি। মুখে চোখে ছুঁচের মতো তুষারের হাওয়া বিঁধচে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরতে পারচিনে। পাকদণ্ডী পাহাড়ের পথ, দীর্ঘ লম্বা চড়াই নয়, গোলকধাঁধাঁর মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠচি। বুকের মধ্যে দম আছে প্রচুর, কিন্তু পা ক্লান্ত হচ্চে। একটু দাঁড়িয়ে আবার উঠতে থাকি। আজ আমি আগে আগে। ব্যথা নেই, ক্লান্তি নেই, উৎসাহহীন নই, পিছনের পথ কুয়াশায় অবলুপ্ত, সন্মুখে হিমালয়ের অনন্ত কুহেলিকা, পথের ধারে ধারে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে রয়েছে, ঝরনাগুলি সাবানের ফেনার মতো গলে পড়চে।

ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হয়ে উঠল। সে-আলো আকাশের নয়, রৌদ্রের দীপ্তির নয়, বিদ্যুৎ-বহ্নির নয়—সে এক নতুন অলৌকিক

আলো—তুষার-শুভ্রতার তীব্র তীক্ষ্ণ আলো। আলোর স্রোত, আলোর সমুদ্র, আলোকধাঁধাঁ। চোখের দৃষ্টি উগ্র যন্ত্রণায় বুজে এল, চোখ জুড়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধের মতো সংকীর্ণ পথরেখার উপরে পা বুলিয়ে বুলিয়ে হাঁটচি। দেখতে দেখতে আবার নূতন উপসর্গ দেখা দিল। উঠল ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিউলিফুলের মতো তুষারবৃষ্টি, তার সঙ্গে দানা-দানা জল। কী কঠিন ঠাণ্ডা! আঃ, আর বুঝি আত্মরক্ষা হল না, আর কত দূর আছে কে জানে—মন্দির আর কত দূরে? মাথার উপরে পড়েচে বরফ, কাঁধে পড়েচে বরফ, কম্বলটা বরফে সাদা হয়ে গেল, চোখে চাপা দিয়েও চোখ খুলতে পারচিনে, পাগলের মতো ছোটবার চেষ্টা করলাম।

শংখধ্বনি শুনচি। কাঁসরঘন্টার বুঝি আওয়াজ আসছে! কোন্ দিকে? উত্তরে, না দক্ষিণে? আবার কান পেতে শুনলাম। কিন্তু আর যে চলতে পারচিনে, একটিবার শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেব? কিন্তু শুলেই যে থামতে হবে, অন্তিম মুহূর্তের থামা। প্রাণের মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্চি সব ডুব দিচ্চে—রূপ, আলো, শব্দ, চেতনা, নিঃশ্বাস—সব। একবার চীৎকার করে কাঁদতে পারিনে? একবার পারিনে ঝড়ের মতো হেসে উঠতে?

'মহারাজজি, কেঁও খাড়া হুয়া হ্যায়?'—হাতের উপরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ হয়ে উঠলাম। হাতটা ধরে হিড়-হিড় করে কয়েক পা টেনে নিয়ে গিয়ে লোকটি বললে, 'এ্যায়সা হোতা হ্যায় ঠণ্ডেমে, জল্‌দি—জল্‌দি আনা—'

'কোন্ হ্যায় তুম, ছাড়ো ছাড়ো—'

'আও জী, আঁখ খুলো, ম্যায় অম্‌রা সিং হ্যায়। আও, পুল্ আ গৈ।' অম্‌রা সিং আমাকে টেনে নিয়ে চললো।

তখন মন্দাকিনী-দুধগঙ্গার পুলের কাছাকাছি এসে গেচি। কাঁসর-

ঘণ্টার শব্দ অদূরে আবার শোনা গেল। দুচারজন যাত্রী দূরে ছায়ার মতো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্চে। পুল পার হয়েই সামান্য লোকালয় ও কয়েকটা পাথরের ঘর, দু'একটি দোকান, পথগুলি পাথর-বাঁধানো। ঘর-দুয়ার, দোকান-পাট, পথ-ঘাট সমস্ত কঠিন বরফের স্তূপে ঢাকা। তার উপর দিয়েই আনাগোনা চলচে।

পথ ঘুরেই সম্মুখে তুষারময় হিমালয়ের পটভূমিকায় কোদরনাথের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখে প্রস্তরময় বেদিকার উপরে পথের দিকে পিছন ফিরে বিরাট পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট। চোখে বরফের আলো এতক্ষণে একটু সয়ে গেচে, এবারে আর তেমন কষ্ট হচ্চে না। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরচে, পায়ের চামড়া ফেটে গেচে। তা যাক, বাইরে পাদুকা ত্যাগ করে এই পরম রূপবান মন্দিরের ঘনান্ধকার অন্দরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম। ভিতরে তখন জনকয়েক অর্ধ-উন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী কেদারনাথের বিপুল দেহের উপর ওলোটপালোট খাচ্চে। কেদারনাথ মূর্তিমান নন, কর্কশ অসমতল বড় একখানা পাথরের খণ্ড—তা হোক, তাকেই আলিঙ্গন করে কেউ হাসচে, কেউ কাঁদচে, কেউ চীৎকার করচে, কেউ ধরেচে গান, কেউ করচে আর্তনাদ ও করুণ মিনতি। আবেগ, উত্তেজনা, উল্লাস, আর্তস্বর, পূজাপাঠ, স্তবমন্ত্র, স্নেহ-ভালোবাসা, ভক্তি ও আনন্দ—কিন্তু স্থাণু ও বধির প্রস্তরস্তূপ অচঞ্চল নীরবতায় তেমনি করেই পড়ে রইল। ভিতরটায় কালিবর্ণ অন্ধকার ও কঠিন অসহ্য প্রাণান্তিক ঠাণ্ডা, পা পেতে দাঁড়াবার উপায় নেই; সম্মুখে এই পথশ্রান্ত পাগলের দল আত্মহারা হয়ে কোলাহল করচে!

অন্ধকারের ভিতর থেকে পা বুলিয়ে বুলিয়ে দরজা দিয়ে বার হয়ে এলাম। হাত, পা, মুখ ঠাণ্ডায় বেঁকে যাচ্চে, নেমে এসে

কোনোক্রমে জুতো জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ছুটতে ছুটতে চললাম। মুখে একরকম শব্দ করতে করতে এসে ধর্মশালায় উঠলাম।

ছোট্ট পাথরের ঘরখানি বরফের মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে রয়েচে। ভিতরে আমরা কয়েকজন যাত্রী। কম্বল জড়িয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে, কারো মুখে আর কথা নেই, চোখে ও মুখে সকলেরই প্রাণভয়ের চিহ্ন। বাইরে মেঘলা আকাশ, প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে তুষার ঝরে পড়চে। কোনো কোনো স্থানীয় লোক লোহার অস্ত্র নিয়ে বরফ কেটে আপন চলাচলের পথ সুগম করচে।

এমন সময় অম্‌রা সিং কতকগুলি কম্বল আর কাঠ এনে হাজির করল। পাণ্ডারা এদেশে বিনামূল্যে কম্বল ধার দিয়ে যাত্রীদের সাহায্য করেন, কাঠও তাঁরা কিছু এমনিই আনিয়ে দেন। অম্‌রা সিং একটা লোহার খাপ্‌রায় কাঠের আগুন জ্বাললো। আগুন দেখে আমাদের কী আনন্দ! ও যেন মৃতসঞ্জীবনী, ও যেন আমাদের সকলের লুপ্ত পরমায়ু! কাঠ এত ঠাণ্ডা যে ভালো করে জ্বলতে চায় না, তবু সেইটুকু আগুনের চারিদিকে যাত্রীরা গিয়ে বসলো। কেউ তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়, কেউ দেয় পা। হাত-পা পুড়ে যাক, ছ্যাঁকা লাগুক, গ্রাহ্য নেই—আগুন নিয়ে কাড়াকাড়ি, ঝটাপটি, আগুন নিয়ে মনোমালিন্য। কোমরভাঙা চারুর-মা এতক্ষণ ঠাণ্ডার জ্বালায় কম্বলরাশির তলায় আত্মগোপন করে ছিল, এইবার হঠাৎ একখানা কম্বল হাতে নিয়ে উঠে পাগলের মতো আগুনের দিকে এগিয়ে গেল, দিল কম্বলখানা আঙ্‌রাগুলির মধ্যে ঢুকিয়ে। একটি রোঁয়াও তার পুড়ল না, বামুনবুড়ি হাঁ-হাঁ করে উঠতেই সে আবার সেখানা তুলে নিয়ে উঁচুতে ধরে কিয়ৎক্ষণ তাতালো, তারপর আবার এল এগিয়ে। কাঠের মতো কঠিন ও নিশ্চল হয়ে এতক্ষণ একপাশে আমি বসে ছিলাম, চারুর-মা হঠাৎ সেই গরম কম্বলখানা খুলে আমার গায়ে

জড়িয়ে দিল। বললে, 'সব আগুনটুকু ওরা চেটে খাচ্চে, তুমিও যে একটা মানুষ তা আর ওদের···কম্বলখানা একটু গরম হয়নি, হ্যাঁ বা'ঠাউর ?' বলেই সে আবার সেই কম্বলরাশির তলায় গিয়ে ঢুকল।

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা হয়ত ছিল, কিন্তু শক্তি ছিল না। শুধু কেবল শীতকাতর মুখখানা ফিরিয়ে এই স্নেহময়ী বৃদ্ধার দিকে তাকালাম।

॥ অনুশীলনী ॥

১। হিমালয়-ভ্রমণে গিয়ে আকাশ, তুষার, পথ, পর্বত, বরফ, ঝরণা—এগুলির যে দৃশ্য লেখকের চোখে পড়েছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। কুয়াশা কেটে যাবার পর লেখক যে আলো দেখেছিলেন সেটা কী রকম ?

৩। 'দেখতে দেখতে আবার নূতন উপসর্গ দেখা দিল'—পুরানো উপসর্গ কী ছিল ? নূতন উপসর্গটা কী ?

৪। কেদারনাথের মন্দিরে লেখক যেভাবে পৌঁচেছিলেন সেই কষ্টকর পথযাত্রা বর্ণনা কর। মন্দিরে পৌঁছে লেখক কী দৃশ্য দেখলেন ?

৫। 'কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা হয়ত ছিল, কিন্তু শক্তি ছিল না'—যে ঘটনার প্রসঙ্গে এই কৃতজ্ঞতা, তা বর্ণনা কর।

৬। অমরা সিং আর চারুর মা—এদের তোমার কেন ভালো লাগে ?

৭। সরলার্থ কর : (ক) সে আলো আকাশের······আলোকধাঁধা।

(খ) প্রাণের মধ্যে ধীরে ধীরে·········নিঃশ্বাস—সব।

(গ) স্থাণু ও বধির প্রস্তরস্তূপ·········পড়ে রইল।

৮। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো :

পাকদণ্ডী, কুহেলিকা, বিদ্যুৎ-বহ্নি, স্থাণু, মৃতসঞ্জীবনী, পরমায়ু, মনোমালিন্য।

৯। **কর্মশিক্ষা** ॥ 'মন্দিরময় ভারত' শীর্ষক একটি কর্মপ্রকল্প গ্রহণ কর। বিভিন্ন চার্ট, ছবি ও মডেলের সাহায্যে উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের বিখ্যাত মন্দিরগুলি সম্পর্কে জানবার চেষ্টা কর। পরে ঐগুলি দিয়ে প্রদর্শনী সাজাও।

দেখবার চোখ ও বোঝবার মন সামান্য একটু তৈরি থাকলেই ঘরের কাছাকাছি কত-না দর্শনীয় জিনিস ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সেই সব উপকরণ সংগ্রহ করেই বাংলা ও বাঙালীর সত্যিকার ইতিহাস রচনায় ভবিষ্যতের গবেষকরা এগিয়ে আসবেন। 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থের লেখক গ্রাম-বাংলার এক শিল্পীর অনলস শিল্প-সাধনার কথা বলেছেন এ নিবন্ধে।

জয়নগর-ডায়মণ্ডহারবার রুটের বাসে করে বাজারবেড়িয়ার মোড়ে নেমে শেষ আধ-মাইলটাক পথ পায়ে হেঁটে উপস্থিত হয়েছিলাম কিশোরী কর্মকারের কুটিরে। সামনের চালার নীচে দিয়ে বাড়ির ভিতরে যাবার পথ। তার ছ'পাশে গোবর-নিকানো উঁচু মাটির দাওয়া। তার একটিতে বসে, খুব ছোট কোদালের মত এক যন্ত্র দিয়ে এক কাঁচা কাঠের গুঁড়ির উপরকার ছাল তুলে ফেলছিল কিশোরী কর্মকার। আমাদের দেখে, কাঁধে গামছা ফেলে, দাওয়া থেকে নেমে এল সসম্ভ্রমে।

এ গ্রামে কিশোরীদের বসবাস বহুকালের। গত ছু-তিন পুরুষ ধরে এ পরিবার প্রধানত কাঠখোদাই-শিল্পী। চৈতন্যপুরে কয়েক ঘর মৃৎশিল্পীও আছেন। তাঁরা মাটির খেলনা-পুতুল ও প্রতিমা নির্মাণ করেন। পটের কাজেও তাঁদের দক্ষতা আছে শুনেছি। মহেশপুরে শোলা-শিল্পী পরিবারের সংখ্যা চল্লিশের কম নয়। ছ'মাইল দক্ষিণ-পুবে গোপালনগর তো কুম্ভকার ও মৃৎশিল্পীদের জন্য বিখ্যাত।

গ্রামীণ কারুশিল্পের এই নিবিড় পরিবেশের মধ্যে কিশোরী তার পৈতৃক পেশায় নিযুক্ত আছে সারা জীবন। ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার কাছে সেই যে হাতুড়ি-বাটালি ধরতে শিখেছিল, আজও তাতে বিরাম নেই। কিশোরী বাড়িতে বসে পুতুলনাচের কাঠের পুতুল বানায়, নানা রঙের সাজপোশাক পরিয়ে তাদের পালাগানের এক-একটি চরিত্রে পরিণত করে, তারপরে দু'চারজন সাগরেদ সঙ্গে নিয়ে উৎসব-পার্বণের জমায়েতে নাচ দেখাতে বেরিয়ে পড়ে। নাচের পালাগুলি কালজয়ী রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে আহৃত। গ্রামীণ জনতার কাছে সে সব কাহিনীর আকর্ষণ এখনও যে কত গভীর, তা শহুরে ফুলবাবু ছাড়া আর সকলেই জানেন।

পুতুলের নিম্নাঙ্গ বাদ দিয়ে তৈরি হয়। মাথা, ধড়, দুই হাত ও কোমরের নীচের সামান্য একটু অংশ আলাদা কাঠের টুকরোয় তৈরি করে ধড়ের সঙ্গে শিক দিয়ে লাগিয়ে নেওয়া হয়। কাঁধ ও কনুই-এ কব্জা বসানো থাকে যাতে অদৃশ্য সুতো টেনে তাদের নড়ানো-চড়ানো যায়। মাথা ও ধড়ের নীচে যে শিক বসানো থাকে, সেগুলিকে মোচড় দিয়ে মাথা ও ধড়কে দু'পাশে ফেরানো যায়। পিঠের দিকের অংশ যতখানি সম্ভব খুব্‌লে ফেলে দিয়ে পুতুলগুলিকে হালকা করে নেওয়া হয়; নাচাবার দণ্ডটি কোমরের নীচের অংশের ভিতর দিয়ে এসে এই শূন্য স্থানটি অতিক্রম করে মাথার নীচে সংবদ্ধ হয়। 'চরিত্র' অনুযায়ী পরিচ্ছদ ছাড়াও শণের চুল, গোঁফ, দাড়ি ও অলংকার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মুখমণ্ডল বা অন্য অনাবৃত অংশে রং লাগানো হয়—যেমন কৃষ্ণের শ্যাম বা রাধিকার সোনালী। নাচের স্টেজও যারপরনাই সাদাসিধে। একেবারে সামনে থাকে মাদুর বা দরমার অনুচ্চ বেড়া। পুতুল-নাচিয়ে ও গায়কেরা বসেন সেই বেড়ার পিছনে। তাদের পশ্চাতে, একটু তফাতে, খুব চটকদার রঙে আঁকা মালা-হাতে-পরী, ফুলে-ভরা-বাগান প্রভৃতির

'সিন' টাঙানো থাকে। কিশোরী এসব দৃশ্যপট হয় নিজেই এঁকে নেয়, নয়ত সরদনা গ্রামের মুসলমান পটুয়াদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। মোটা মার্কিন থানের এক পিঠে তেঁতুলবিচির গুঁড়ো সিদ্ধ-করা আঠার প্রলেপ লাগিয়ে যে জমিন তৈরি হয়, তার উপর সাধারণত জল-রং দিয়েই এসব 'সিন' আঁকা হয়ে থাকে।

কাঠখোদাই কাজটা ঠিক কীভাবে করা হয় সে কথায় এলাম। কিশোরী বললে, সে কাজেই তো বসেছিলাম বাবু, যখন আপনারা এলেন। চলুন হাতে-হাতিয়ারে দেখাই আপনাদের। দাওয়ার অপর অংশে সেই কাঠের গুড়িটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল কিশোরী। হাতিয়ার বলতে, ছাল ছাড়াবার জন্য খুব ছোট কোদালের মতো ধারালো ব্লেড-এর একটি যন্ত্র ও ছোট-বড় সাইজের দু'চার প্রস্থ হাতুড়ি-বাটালি। প্রথম যন্ত্রটি নিয়ে অবলীলাক্রমে সবটা বাকল সে ছড়িয়ে ফেলল। সদ্য গাছ থেকে কাটা রসযুক্ত নরম জিউলী কাঠ ব্যবহার করাই রীতি। এবার হাতুড়ি-বাটালি তুলে নিয়ে খোদাই কাজ সুরু করল কিশোরী। বাটালি যে এত ক্ষিপ্র ও নির্ভুলভাবে চালানো যায় তা চোখের উপর ঘটল বলেই বিশ্বাস করতে পারলাম। দেখতে দেখতে আট-দশ মিনিটের মধ্যে সেই নিরবয়ব কাঠের কুঁদোর গায়ে চুলের রেখা, কপাল, চোখ, নাক, মুখ, কান, চিবুক, গলা—সব ফুটে উঠল যেন মন্ত্রবলে।

একমনে এতক্ষণ কাজ করে হাতুড়ি-বাটালি নামিয়ে রাখল কিশোরী। এপাশ-ওপাশ ঘাড় ফিরিয়ে ভাল করে দেখল তার সৃষ্টিকে। তার পরে সলজ্জ একটু হাসি টেনে এনে বললে—দেখলেন তো বাবু! এইভাবেই পুতুল গড়তিছি বহুকাল।

আমি মনে মনে ভাবলাম—বহুকাল নয়, বহু পুরুষ। আমাদের অধিকাংশ কুটিরশিল্পের দক্ষ কারিগরদের যে অসামান্য নৈপুণ্য তা বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। অনেক ক্ষেত্রেই

সে অতুলনীয় পারদর্শিতা এক পুরুষে সম্ভব নয়। সহজ করে কথাগুলো বললাম কিশোরীকে।

তাই যদি হবে বাবু, তবে আমাদের এক পুরুষের এই পেশা আমার ছেলেরা নিলে না ক্যানে?—গভীর পরিতাপে কিশোরীর গলাটা যেন ধরে এল।

কিশোরীর ছেলেরা এক-আধবার বাড়ির বাইরে এসে আমাদের আলোচনা শুনে গেছে, কিন্তু তাতে যোগ দেয় নি, কোন উৎসাহও দেখায় নি। এইবার কিশোরীর আমন্ত্রণে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখি, উঠোনের পাশে যে কামারশালা, তার হাপরের আশ-পাশে ছেলেরা তার নানা কাজে ব্যস্ত। একরাশ অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি তারা ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে, আরও বানানোর কাজ চলছে।

ছেলেদের সঙ্গে কথা বললাম কিছুক্ষণ। তাদের যুক্তি তীক্ষ্ণ ও সংক্ষিপ্ত। পুতুলনাচের কারিগর ও পালা-গাইয়ে হিসেবে তাদের বাবা মাসে যা উপার্জন করেছে এতদিন, তাতে সামান্য জমিজমার আয় যোগ করে আগে হয়ত কোনগতিকে সংসার চলে গেছে। এখন বর্ধিত পরিবারের খরচ মেটানো অসম্ভব। শল্য-চিকিৎসার এসব যন্ত্রপাতি বারুইপুরের সরকারী কারখানা থেকে ইলেকট্রোপ্লেটিং করিয়ে নিয়ে তারা ভাল দামে কলকাতার বাজারে বিক্রী করে। স্বীকার করতে বাধা নেই, তাদের আমি দোষী করতে পারিনি, বিমর্ষ কিশোরীকেও সান্ত্বনা দিতে পারিনি। এ সেই সংকট, যার কবলে পড়ে আমাদের আরও অনেক গ্রামীণ চারুশিল্প হয় ইতিপূর্বেই লোপ পেয়েছে, নয়ত অন্তিম দিনগুলি গুনছে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। কাঠখোদাই-শিল্পী, মৃৎশিল্পী, পটশিল্পী—কার কী রকম কাজ বল।

২। 'পুরাণ' কাকে বলে? পৌরাণিক উপাখ্যান দু'একটির নাম কর। রামায়ণ ও মহাভারতের আদি রচয়িতা কারা? রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের দু'জন করে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম কর।

৩। পুতুলনাচের পুতুল কীভাবে তৈরি করা হয়? পুতুলনাচের মঞ্চ, পর্দা ইত্যাদি বর্ণনা কর।

৪। পুতুল তৈরির জন্য কাঠখোদাই কাজ কীভাবে হয় তার বিবরণ দাও।

৫। 'তাই যদি হবে বাবু, তবে আমাদের এত পুরুষের এই পেশা আমার ছেলেরা নিলে না ক্যানে'—কে, কাকে, কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছিল? বক্তার ছেলেরা কোন্ পেশা গ্রহণ করেছিল, কেনই বা করেছিল?

৬। সরলার্থ কর : স্বীকার করতে বাধা……সান্ত্বনা দিতে পারিনি।

৭। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো :
সসম্ভ্রমে, মৃৎশিল্পী, কারুশিল্প, সাগরেদ, জমায়েত, ফুলবাবু, সংবদ্ধ, হাতিয়ার, বংশানুক্রমিক।

৮। **কর্মশিক্ষা** ॥ (ক) শিক্ষকমশায়ের সাহায্যে কাপড়, কাগজ, তুলো বা কাঠ দিয়ে পুতুল তৈরি কর কয়েকটি। পুতুলের সাজপোশাক তৈরি কর। কাগজের মণ্ড দিয়ে মুখোশ তৈরি করতে পার। মঞ্চ ও পর্দা তৈরি করে পুতুলনাচের অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

(খ) তোমাদের ইস্কুলে যদি কাঠের কাজের সুযোগ থাকে তাহলে কাঠের কিছু কিছু জিনিস তৈরি করে মেলার প্রদর্শনীতে রাখ।

●

বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—এই নিয়ে ভারতীয় আর্যদের সাহিত্য। ঈশ্বর কী, তিনি আছেন কি না, মানুষ কী করলে ঈশ্বরত্ব লাভ করতে পারে—এই সব প্রশ্নের আলোচনা ও উত্তর রয়েছে আরণ্যক ও উপনিষদে। উপনিষদগুলি রচিত হয় সম্ভবত ৮০০ থেকে ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। লেখকের 'গল্পে উপনিষৎ' থেকে এই কাহিনীটি সংকলিত।

দেবতা, মানুষ ও অসুর সকলকেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলেই এক ব্রহ্মার সন্তান, ভাই-ভাই। ব্রহ্মাকে এইজন্য বেদে বলে প্রজাপতি, এবং পুরাণে বলে পিতামহ। তিন ভাই-ই ক্রমে বড় হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার বয়স হইল। সকলে একত্র হইয়া আর কোথায় যাইবেন—পিতার আশ্রমে শিষ্যের মত ব্রহ্মচর্য পালন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচর্য ভিন্ন তেজ হয় না এবং তেজ না হইলে প্রকৃত বিদ্যালাভ হয় না।

এইভাবে ব্রহ্মচর্য সাধন করিতে করিতে তিন ভাই-এর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। দেবগণ ক্রমে অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের স্বভাব নির্মল হইতেছে, তাঁহাদের অন্তরে তেজ জন্মিয়াছে। সকলের আগে তাঁহারা গিয়া একদিন প্রজাপতিকে বলিলেন, 'ভগবন্, আপনি আমাদের উপদেশ করুন, আমরা অনেককাল ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি।'

প্রজাপতি কিন্তু দেবতাদিগকে কোন কথা বলিলেন না, শুধু মুখে উচ্চারণ করিলেন 'দ' ; এবং কিছু পরেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা বুঝিলে তো আমি কী বলিলাম ?'

দেবতাগণ সকলেই একবাক্যে উত্তর করিলেন, 'হাঁ, বুঝিয়াছি।'

প্রজাপতি—'কী বুঝিয়াছ ?'

দেবগণ—'দাম্যত—আপনি আমাদিগকে বলিলেন, দমন কর, দমন কর!'

প্রজাপতি শুনিয়া খুশি হইয়া বলিলেন, 'হাঁ, ঠিকই বুঝিয়াছ।'

দেবতারা ছিলেন শুদ্ধ-বুদ্ধি ; দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালন করিতে গিয়া তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয়-দমন সকল তপস্যার মূল। তাই প্রজাপতির মুখে 'দ' শুনিয়াই তাঁহাদের মনে হইতেছিল, পিতা বলিতেছেন, দমন কর, দমন কর।

তারপর মানুষ যাঁহারা, তাঁহারা গিয়া একদিন প্রজাপতিকে বলিলেন, 'ভগবন্, এইবার আমাদের উপদেশ করুন।'

প্রজাপতি এবারও উত্তরে একটি মাত্র অক্ষর বলিলেন, 'দ' ; এবং বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা বুঝিলে তো আমি কী বলিলাম ?'

মানুষেরাও সকলে একবাক্যে উত্তর করিলেন, 'হাঁ, বুঝিয়াছি।'

প্রজাপতি—'কী বুঝিয়াছ ?'

মানুষেরা—'দত্ত—আপনি বলিলেন, দান কর, দান কর!'

প্রজাপতি শুনিয়া আগেকার মতই খুশি হইলেন এবং মানুষগণকেও বলিলেন, 'হাঁ, ঠিকই বুঝিয়াছ।'

মানুষেরা ছিলেন স্বভাবতঃ কিছু লোভী, এবং দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে গিয়া সে কথা তাঁহারা বুঝিয়াও ছিলেন। তাই প্রজাপতির মুখে 'দ' শুনিয়া তাঁহাদের মনে হইতেছিল, পিতা বলিতেছেন, দান কর, দান কর!

সবশেষে আসিলেন অসুরগণ। তাঁহাদেরও অনেককাল ব্রহ্মচর্য হইয়াছিল, তাঁহারাও গিয়া প্রজাপতিকে বলিলেন, 'ভগবন্, আপনি আমাদেরও উপদেশ করুন।'

'দ'—প্রজাপতি অসুরদিগকেও ঐ একটি মাত্র অক্ষরই বলিলেন ; এবং বলিয়া তেমনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা বুঝিলে তো আমি কি বলিলাম ?'

অসুরগণ—'দয়ধ্বম্—আপনি বলিলেন, দয়া কর, দয়া কর!'

প্রজাপতি শুনিয়া তেমন খুশি হইলেন এবং অসুরদিগকে প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, 'হাঁ, ঠিকই বুঝিয়াছ।'

অসুরেরা ছিলেন বড় ক্রূর, হিংস্র প্রকৃতির ; তাই প্রজাপতির মুখে 'দ' শুনিয়াই তাঁহাদের স্বভাবতঃ মনে হইতেছিল, পিতা বলিতেছিলেন, দয়া কর, দয়া কর! প্রাণিগণকে দয়া কর!

আমাদের পিতামহ প্রজাপতির সেই অনুশাসন আজিও চলিয়া আসিতেছে। আজিও আকাশে যখন মেঘ ডাকে, মেঘের মধ্যে প্রজাপতির সেই বাণীই ধ্বনিত হয়, বিদ্যুৎ-চমকে সেই বাণীই ফুটিয়া উঠে—দ! দ! দ!—দাম্যত! দত্ত! দয়ধ্বম! প্রজাপতি মেঘের ডাকে বলিতে থাকেন, 'দ! দ! দ! দমন কর! দান কর! দয়া কর!'

ঋষি বলিতেছেন, 'তাই এই তিনটি শিক্ষা করিবে—দম, দান ও দয়া।' দম, দান, দয়া—ইহা আমাদের পিতামহ প্রজাপতির একটি বড় শিক্ষা।

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'পিতামহ প্রজাপতির সেই অনুশাসন আজিও চলিয়া আসিতেছে'—কোন্ অনুশাসনের কথা এখানে বলা হয়েছে? দেবতা, মানুষ এবং অসুর—এরা সেগুলির কীভাবে অর্থ করেছিলেন? এই অনুশাসনগুলিকে তোমরা কীভাবে নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পার?

২। সরলার্থ কর : আজিও আকাশে...বাণীই ফুটিয়া উঠে।

৩। অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো : ব্রহ্মচর্য, শুদ্ধবুদ্ধি, ক্রূর, অনুশাসন।

৪। **সমাজসেবা** ॥ 'জীবে দয়া ভগবানেরই পূজা'—স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে কোন পাড়ায় একটি সমাজসেবার কর্মসূচি নাও।

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল—প্রায় দু'শ বছরের দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি কাটিয়ে ভারত কীভাবে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করল, সেই দেশভক্তির স্মৃতিতে মাখা জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী। 'ভারত আমার' নামক পুস্তকের অন্তর্গত নিবন্ধ।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হল। পলাশীর আমবাগানে সেদিন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা গেলেন হেরে। জয় হল বিদেশী ইংরেজদের। তারপর বুদ্ধিমান ইংরেজ জাতি ধীরে ধীরে ছলে-বলে কৌশলে বাংলার শাসনভার হস্তগত করল। পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে তারা সমগ্র ভারত জয় করে ভারতের অধীশ্বর হয়ে বসল।

ইংরেজ শাসকদের শাসনব্যবস্থা ভারতবাসীদের মনঃপূত হয়নি। ভারতবাসী সহ্য করতে পারেনি ইংরেজের নির্যাতন ও অপমান। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড গণবিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল। মেদিনীপুর, চব্বিশপরগনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় খণ্ড বিদ্রোহ বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসক অতি সহজেই সে সব বিদ্রোহ দমন করেছিল।

জাতীয় জাগরণের পরবর্তী পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের 'সিপাহী বিদ্রোহ'। সিপাহী বিদ্রোহকে বলা হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। সুরু হল বহরমপুরে—সেখান থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতে। ইংরেজরা কঠোর হস্তে বিদ্রোহ

দমন করল। এই বিদ্রোহের সময়েই ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রাণ হারালেন। বিঠুরের নানাসাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি হল। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বর্মায় নির্বাসিত হলেন। ব্যর্থ হল সিপাহী বিদ্রোহ। কিন্তু হাজার হাজার শহীদের আত্মবলিদান ব্যর্থ হল না। তা ভারতবাসীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলল।

এরপর ১৮৫৯-৬০ সালে সুরু হল 'নীল আন্দোলন'। সেকালে এদেশে নীল চাষ হত। নীলচাষ করবার জন্যে নীলকর সাহেব ও কুঠিয়ালরা কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। তারই বিরুদ্ধে দেখা দিল কৃষক বিদ্রোহ—'নীল বিদ্রোহ'। এদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পাদ্রী লং সাহেবের কারাদণ্ড হল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়লেন। মামলা সুরু হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। সারা দেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করল। তখন লোকের মুখে মুখে শোনা গেল:

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার,
অসময়ে হরিশ মলো, লঙের হল কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার!

সুচতুর ইংরেজ শাসক নীল আন্দোলনও দমন করল। কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। ভারতে জাতীয় আন্দোলনের স্রোত আরও প্রবল বেগে বইতে লাগল।

এই সময় দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে দীক্ষা দিতে লাগলেন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওআরও কয়েকজন। দেশের সংবাদপত্রগুলিও দেশে আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্যে উৎসাহ দিতে লাগল। দেশের কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিকেরা জাতির মানসপটে দেশমাতার চিন্ময়ী রূপটি তুলে ধরলেন; দেশবাসীকে

উদাত্ত আহ্বান জানালেন ঃ 'ওঠ, জাগো, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙো।' দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এ আহ্বান ধ্বনিত হতে লাগল। আর সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র জাতির প্রাণে দেশপ্রেমের নতুন উন্মাদনা জাগালো।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে দেশের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল। কয়েক বছর বাদেই, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে বিভক্ত করে দিলেন। ফলে দেশের মরা মানুষও যেন বেঁচে উঠল। বিভক্ত বাংলাকে এক করবার জন্যে তারা আন্দোলনে মেতে উঠল। জাতি স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা নিল, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার শপথ নিল। ইংরেজ শাসকরা তাতেও টলল না। তখন দেখা দিল বিপ্লববাদ; ভারতে গড়ে উঠল বিপ্লবী দল।

মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় ভুলবশত দু'জন ইংরেজ মহিলার প্রাণনাশে ফাঁসীতে প্রাণ দিলেন ক্ষুদিরাম বসু। তাঁর সহযোগী প্রফুল্ল চাকী ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। কলকাতার মানিকতলা বাগানে বিপ্লবীরা বোমা বন্দুক, কার্তুজ ইত্যাদি তৈরির কারখানা গড়েছিলেন। তাঁদের দলের প্রায় সবাই ধরা পড়লেন। এমনি ভাবে যখন গুলি-গোলা চলতে লাগল তখন ইংরেজদের হুঁস হল। বুঝল, ভারতবাসীর এ অসন্তোষ আর জিইয়ে রাখা ঠিক হবে না। ইংরেজ-শাসক তখন বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করল। সেটা ১৯১১ সাল।

এরপর জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এলেন মহাত্মা গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অহিংস আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন ১৯১৫ সালে। বাংলায় তখন জোর বিপ্লববাদ। বিপ্লবীদল রুখে দাঁড়িয়েছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বাংলার লাট এনড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছেন বিপ্লবীদল। বালেশ্বরে বাংলার বীর সন্তান বাঘা যতীন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সহযোগীদের সাথে প্রাণ

দিয়েছেন। ভারত ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত। হাজার হাজার মানুষ জেলে আটক। গান্ধীজী ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বাধীনতার সংগ্রামে।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল, পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনসাধারণ বৈশাখী মেলা দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের উপর নির্মম ভাবে গুলি চালালো ইংরেজ সৈন্য। নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল বহু ভারতীয়কে।

১৯২০ সালে গান্ধীজী আরম্ভ করলেন 'অসহযোগ আন্দোলন' ও 'আইন অমান্য আন্দোলন'। সর্বক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে শাসনযন্ত্র অচল করে দেওয়াই তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য। কোটি কোটি ভারতবাসী গান্ধীজীর অনুগামী হলেন। তাঁদের মধ্যে জহরলাল নেহেরুও অন্যতম।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। দেশবাসীর মতামত না জেনেই তখনকার বড়লাট ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেললেন। দেশে আবার প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল। সুরু হল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ১৯৪২ সালের এই গণ-আন্দোলন ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে দেখা দিল। নাম তার 'অগস্ট আন্দোলন'। ঐ সময় সুভাষচন্দ্র বসু আত্মগোপন করে আফগানিস্তান ও রাশিয়ার পথে জার্মানীতে চলে গেলেন। সেখান থেকে গেলেন জাপানে। অতঃপর তিনি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। বর্মার ভিতর দিয়ে সেই ফৌজ নিয়ে ভারত সীমান্তে উপস্থিত হলেন নেতাজী। 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে ভারত সীমান্ত মুখরিত হল।

ইংরেজ শাসকরা তখন প্রমাদ গণলেন। লণ্ডন থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ছুটে এলেন ভারতে দৌত্য করতে। মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ জিন্না তখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবী করলেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর কংগ্রেস ভারত বিভাগে রাজী হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট সোনার ভারত ভেঙে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়া হল—ভারত আর

পাকিস্তান। আর সেই সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘটল।

॥ অনুশীলনী ॥

১। এই প্রবন্ধে কয়েকটি নতুন কথার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটেছে—জাতীয় জাগরণ, দেশাত্মবোধ, আন্দোলন, জাতীয়তাবোধ, স্বাদেশিকতা, বিপ্লববাদ, অসহযোগ—এগুলির প্রকৃত অর্থ শিক্ষকমশায়ের কাছে জেনে নাও। ইতিহাসেও এ কথাগুলি জানতে পারবে।

২। 'নীল আন্দোলন' কী ? কেন হয়েছিল ? ইংরেজ একে দমন করল কীভাবে ?

৩। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিচয় দাও। বঙ্গভঙ্গ হল কেন ?

৪। 'জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এলেন গান্ধীজী'—গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচয় দাও। ভারত কীভাবে স্বাধীনতা ফিরে পেল ?

৫। টীকা লেখো : সিপাহী বিদ্রোহ ; নীল বিদ্রোহ ; বঙ্কিমচন্দ্র ; বিপ্লববাদ ; বাঘা যতীন ; জালিয়ানওয়ালাবাগ ; অসহযোগ আন্দোলন ; সত্যাগ্রহ আন্দোলন ; আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।

৬। সরলার্থ কর : হাজার হাজার শহীদের……জাগিয়ে তুলল।

৭। নীচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো :

অধীশ্বর, মনঃপূত, আলোড়ন, ছারেখার, দীক্ষা, মানসপট, চিন্ময়ী, উদাত্ত, জর্জরিত, অনুগামী, দৌত্য, পরিসমাপ্তি।

৮। **কর্মশিক্ষা** ॥ (ক) ভারতের মুক্তি-আন্দোলনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ কর এবং প্রত্যেকটি পর্বের বৈশিষ্ট্য দেখাও। মুক্তি-আন্দোলনের একটি সময়-রেখা (Time-line) অঙ্কন কর।

(খ) 'স্বাধীনতার ভগীরথ'' নামে একটি প্রকল্পকাজ হাতে নাও। যে সব কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারের রচনা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে, তাঁদের রচনার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। বাংলার বিপ্লবী বীরদের জীবনী ও ছবি সংগ্রহ কর। ভারতের মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি-রক্ষার সর্বোত্তম উপায় কী—সে সম্পর্কে সবাই বসে আলোচনা কর।

(গ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বাঘা যতীন, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ—এ বিষয়গুলি অবলম্বনে দেশপ্রেমমূলক নাটিকা অভিনয়ের ব্যবস্থা কর।
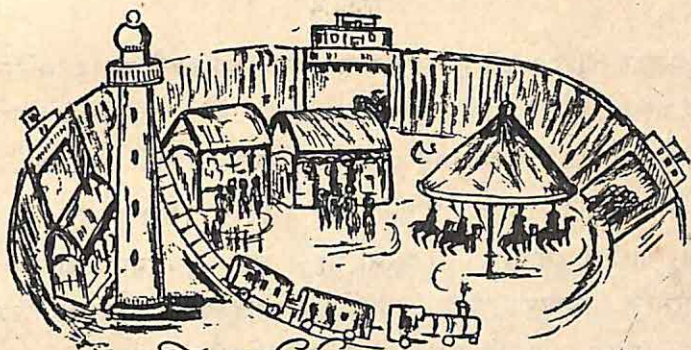
ভারতে যখন ব্রিটিশ রাজত্ব চলছিল তখন জনগণের মনে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের সঞ্চার করেছিল স্বদেশী মেলা। তারই স্মৃতিচারণ করছেন প্রখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর লেখা 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' নামক আত্মচরিতে।

একদিন শুনলাম (তখন ১৯০৫ সালের শীতকাল) আমাদের অঞ্চলেই স্বদেশী একজিবিশন হবে। কোথায় ? এখন যেটা পি. জি. হাসপাতাল, তার যে কোয়ার্টারগুলি আছে তার পূর্বদিকে প্যাণ্ডেল বাঁধা হলো আমাদের চোখের সামনেই। জয়পুর স্থাপত্যরীতিকে অনুসরণ করেই তিনটে ফটক তৈরী হচ্ছে, প্রত্যেকটির ওপরে নহবৎখানা।

সুন্দর সুন্দর সব রাস্তা করা হয়েছিল একজিবিশনে। আর ছিল নানা ধরনের জিনিস। বেনারসী কিংখাব, আমেদাবাদের কাপড়। প্রকাণ্ড একজোড়া বুটজুতো রাখা হয়েছিল একদিকে—মানুষের সমান উঁচু—নর্থ ওয়েস্ট কোম্পানীর তৈরী দেশী জিনিস একেবারে। আর ছিল সাবান-দিয়ে-তৈরী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আবক্ষ মুর্তি, তৈরী করেছিলেন ওরিয়েন্টাল কোম্পানী। ভারতবর্ষের তাবৎ শিল্পের নিদর্শন দেখান হয়েছিল ; ছ'ফুট লম্বা লাউ—প্রকাণ্ড কুমড়ো—এও আছে। আর আছে পূর্ববঙ্গের বিচিত্র নকশা-তোলা কাঁথা, পূর্ববঙ্গের

মিহি-করে-কাটা সুপুরী ঝুড়িতে জড়ো করা। আরেকটি মজার জিনিসের কথা মনে পড়ে। তার নাম ছিল 'লাফিং গ্যালারী'। অনেকগুলি আয়না খাটানো রয়েছে, Silvering-এর কী প্রক্রিয়া তা জানি না, কিন্তু এক-একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষের হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। কোনো মুখটা লম্বা—কোনোটা থ্যাবড়া—কোনোটা পানফলের আকার—বিচিত্র সব মুখভঙ্গী। লোকের ভিড়ও হতো ওখানে। সবাই এক-একবার করে নিজের নিজের কার্টুন দেখে আসতে চান।

একজিবিশনে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও হয়েছিল। উত্তর দিককার ফটকের কাছেই ছিল ব্যাণ্ড বাজানোর জায়গা, যাকে বলে 'ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড।' 'প্রতি সন্ধ্যায় ব্যাণ্ড বাজত সেখানে। নহবতে বাজত সানাই। রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতাম সেই সানাইয়ের কল্পিত সুর-বিস্তার। সেদিনকার কৈশোর মনে সে যে কী মোহ সঞ্চার করত তা বলার নয়।

একজিবিশনের ভিতরে পশ্চিমধার ঘেঁষে যে পুষ্করিণীটা ছিল, তার চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে সুইস ব্যাক রেলওয়ে বা অ্যালপাইন রেলওয়ে তৈরী হয়েছিল, সে-ও এক অভিনব বস্তু। ২৫/৩০ ফিট উঁচু একটা টাওয়ার তৈরী হয়েছিল। তার থেকে ঢালু করে বরাবর তুটি লাইন পাতা নীচে পর্যন্ত। এই লাইনের ওপরে ঘড়ঘড় করে যখন গাড়ী নামছে, তখন সে এক রীতিমত দেখবার জিনিস। হুডখোলা পুরানো মোটর-গাড়ীর মতন দেখতে ক্ষুদে সাইজের, মোট চারজন বসতে পারে। এক-একবার এক-একটা করে ছাড়ত, নইলে ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেতে পারে। ঐ যে টাওয়ারের কথা বললুম, ওটা ছিল ঘেরা। মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি। নীচেকার কোনো কোনো ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আমরা দেখতাম কী, মেঝের নীচে ৫/৬ জন কুলি ঘানির মতো করে ঘূর্ণি যন্ত্রটা ঘোরাচ্ছে ; আর সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে খেয়ে গাড়ী উঠছে একেবারে প্রকাণ্ড চাকতিটার ওপরে। এক-একবার শব্দ হচ্ছে ঘড়াং করে।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতুম, গাড়ি চাকতি থেকে এবার প্যাসেঞ্জার-সুদ্ধু লাইনের ওপরে পড়ল। অমনি উৎসুক হয়ে উঠতাম আমরা, ঐ আসছে রে, ঐ আসছে।

গাড়ি আসছে ওপর থেকে নীচে আঁকা-বাঁকা পথে উঁচু-নীচু হয়ে, কোথাও বা লাফিয়ে উঠল, মনে হল, এই গেল বুঝি সবসুদ্ধু উল্টে। কিন্তু উল্টাতো না, কখনো কোনো দুর্ঘটনার কথা শুনিনি। সেই ওপর থেকে নীচে বেঁকে বেঁকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসত গাড়ি দুরন্ত গতিতে, ছেলেমেয়েরা চেঁচাচ্ছে, ভয়েও বটে, উল্লাসেও বটে। দেখবার মতই দৃশ্য। কিন্তু চড়বার উপায় আমাদের নেই, প্রতিটি সীটের মূল্য পাঁচ টাকা করে। কোথায় পাবো তখন টাকা ?

একজিবিশনে আরও মজার জিনিস ছিল। ছিল মেরী-গো-রাউণ্ড। একটা বড় কাঠের চাকতির ওপরে কাঠের ঘোড়া বসানো, হাতী বসানো, সিংহ বসানো, আবার খুদে মোটরগাড়ীও বসানো। সবগুলিতে লোক বসিয়ে চাকতিটা ঘুরতে থাকত। সেই ঘূর্ণিতে মোটরগুলি স্থির আছে, কিন্তু ঘোড়া-হাতি-বাঘ-সিংহ যে যার জায়গায় প্যাসেঞ্জার সুদ্ধু উঠছে আর নামছে। এতে অবশ্য বড়দের সঙ্গে ছোটদেরও ভিড় হত।

আবার পুষ্করিণীতে হয়েছিল 'ওয়াটার ট্রাইসাইকেল'। তিনটে ছোট নৌকোমতন জিনিস করেছে : কিন্তু বেশ উঁচু, সাধারণ ট্রাইসাইকেলের তুলনায় ডবল উঁচু বলা যেতে পারে। ট্রাইসাইকেলের মতো পা দিয়ে প্যাডল্ করতে হত। করলেই তিনটি চাকার বদলে তিনটি ছোট নৌকা অমনি একসঙ্গে জল কেটে জল ছিটিয়ে সরসর করে চলত এগিয়ে।

কুটির শিল্পের ভালো ভালো নিদর্শনও সেদিনকার একজিবিশনে দেখেছিলাম মনে আছে। মেয়েরা পাঠাতেন মিহি করে কাটা সুপুরীর কথা আগেই বলেছি, বিরাট বিরাট লাউ-কুমড়োর কথাও বলেছি, যা বোধ হয় বলিনি, তা হচ্ছে চিঁড়ের মত সূক্ষ্ম-করে-কাটা নারিকেলের কথা। নানারকম ছাঁচে তোলা আমসত্ত্বের কথা। আর বলিনি, কাঁথার কথা। বিচিত্র ধরনের বিচিত্র নকশা-তোলা কাঁথা। খেলনাই বা ছিল

কতরকম। পাথরের, ধাতুর, গালার, সোনার ও মাটির। ভিড় হত প্রচুর। লোকে লোকারণ্য। আর একজিবিশনও এত বড়ো যে, তিন-চার ঘণ্টাও ঘুরে শেষ করা যায় না।

এসব ছাড়া ছিল যাত্রা, ছিল তরজা আর কবি-গান। ময়ুরপঙ্খীর নাচ। পুকুরে নৌকো সাজিয়ে ভাসান। তার ওপরে গানের দল বসে গান গাইছে। বাস্তবিকই মনটাকে মাতিয়ে তোলবার মতো জিনিস।

॥ অনুশীলনী ॥

১। তুমি কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্যাণ্ডেল দেখেছ? তোমার দেখা একটি প্যাণ্ডেলের বর্ণনা দাও।

২। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন বিখ্যাত ছিলেন?

৩। 'একজিবিশন' কথার অর্থ কী? অ্যালপাইন রেলওয়ে যেভাবে একজিবিশনে সাজানো হয়েছিল তা বর্ণনা কর।

৪। 'ঐ আসছে রে, ঐ আসছে'—কাদের মনের উল্লাস এখানে ব্যক্ত হয়েছে? যে কারণে এ উল্লাস, তার বিবরণ দাও।

৫। মেরী-গো রাউণ্ড এবং ওয়াটার-ট্রাইসাইকেল—এগুলি বর্ণনা কর।

৬। স্বদেশী একজিবিশন-এ কুটিরশিল্পের কী কী নমুনা দেখানো হয়েছিল?

৭। জয়পুর, বেনারস, আমেদাবাদ, বোম্বে—ভারতের মানচিত্র এ শহর-গুলির অবস্থান লক্ষ্য কর। এ শহরগুলি প্রসিদ্ধ কেন?

৮। টীকা লেখো: পি জি. হাসপাতাল, তরজা, কবি-গান, যাদুঘর।

৯। সরলার্থ কর: (ক) সবাই এক-একবার……আসতে চায়।

(খ) সেদিনকার কৈশোর মনে……বলার নয়।

১০। অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো:

স্থাপত্যরীতি, অনুসরণ, কিংখাব, আবক্ষ, কার্টুন, নিদর্শন, লোকারণ্য।

১১। **কর্মশিক্ষা**। (ক) তোমাদের বিভিন্ন কর্মপ্রকল্পের মাধ্যমে যে সব জিনিস তৈরি করেছ সেগুলো দিয়ে একটি প্রদর্শনী সাজাও, মেলার আয়োজন কর। এতে বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও থাকবে। বিবরণপঞ্জীতে (Work Diary) তোমাদের উদ্যোগ আয়োজন-পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করবে।

(খ) তোমার শহরের বা গ্রামের কাছাকাছি কোনো প্রদর্শনী বা মেলা পরিদর্শন করে এস।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যথা দাবানল বেড়ে অনল প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে, সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনলকণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহশিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারিদিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মুরতি,

উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জুনি বিষাদে
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে,
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অস্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।।

।। অনুশীলনী ।।

১। অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যুঘটনার বর্ণনা কর। একে 'অন্যায় বিবাদ' বলা হয়েছে কেন?

২। সপ্ত রথী কে কে?

৩। সরল ভাষায় বুঝিয়ে দাও :

(ক) সে কাল অনলতেজে……রোষে, ভয়ে।।

(খ) আঁধারি চৌদিক………গ্রাসিলা বীরেশে যম।

৪। মহাভারত থেকে অভিমন্যু-বধ কথা বিস্তারিত ভাবে জেনে নাও। যারা মাটির কাজ জানো, তারা সপ্তরথী কর্তৃক অভিমন্যুবধ কাহিনী মাটির মডেলে তৈরি করতে পার।

●

সপ্তরথী পরিবেষ্টিত বীর অভিমন্যুর
অন্যায়ভাবে মৃত্যুবরণ যেন কবি উল্লেখ
করেছেন এই চতুর্দশ পদাবলী কবিতায়।

পণরক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'মরাঠা দস্যু আসিছে রে ওই, করো করো সবে সাজ'—
আজমির গড়ে কহিলা হাঁকিয়া দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দু'পহরে যে যাহার ঘরে সেঁকিছে জোয়ারি রুটি
দুর্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে বাহিরে আসিল ছুটি।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া দক্ষিণে বহু দূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধূলা মরাঠি অশ্বখুরে।
'মরাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন' গর্জিলা দুমরাজ॥

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে, 'বৃথা এ সৈন্যসাজ।
হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র দুর্গেশ দুমরাজ!
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার ফিরিঙ্গি সেনাপতি—
সাদরে তাদের ছাড়িবে দুর্গ, আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ বিজয়সিংহ-'পরে,
বিনা সংগ্রামে আজমির গড় দিবে মরাঠার করে।'
'প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে বিরোধ বাধিল আজ'
নিশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে দুর্গেশ দুমরাজ॥

মাড়োয়ার-দূত করিল ঘোষণা, 'ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ।'
রহিল পাষাণমুরতি-সমান দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা যায়-যায়, ধূ ধূ করে মাঠ, দূরে দূরে চরে ধেনু—
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে বাজে রাখালের বেণু।
'আজমির গড় দিলা যবে মোরে পণ করিলাম মনে
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে ছাড়িব না এ জীবনে।
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায় ভাঙিতে হবে কি আজ!'
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস দুর্গেশ দুমরাজ॥

রাজপুত সেনা সরোষে সরমে ছাড়িল সমরসাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়াবসনা সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম-মাঠ-পারে,
মরাঠা সৈন্য ধুলা উড়াইয়া থামিল দুর্গ-দ্বারে,
'দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান—ওঠো ওঠো, খোলো দ্বার।'
নাহি শোনে কেহ; প্রাণহীন দেহ সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ দুর্গেশ দুমরাজ॥

॥ অনুশীলনী ॥

১। দূত কাকে বলে? মাড়োয়ার দেশটি কোথায়? মাড়োয়ার-দূত দুমরাজকে কী নির্দেশ জানিয়েছিলেন? এ নির্দেশ শুনে দুমরাজের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

২। দুর্গেশ দুমরাজের মনে কিসের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল? তাঁর আত্মত্যাগের কাহিনী সংক্ষেপে বল।

৩। সরলার্থ কর: প্রভুর আদেশে·········বাধিল আজ।

৪। **কর্মশিক্ষা।।** কবিতাটির নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয়ের চেষ্টা কর। সাজসজ্জা, মঞ্চ সব ব্যবস্থা তোমাদের।
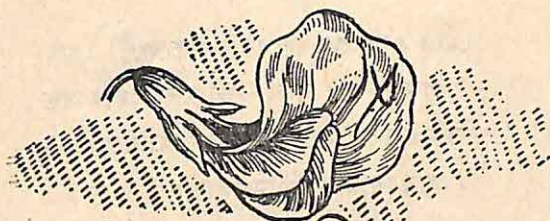
অপরাজিতা

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
  তবু কেন তোর অ-পরাজিতা নাম ?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে ?
  বর্ণ—সেও তো নয় নয়নাভিরাম !
ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু সৌরভ,
  ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চন-ভাতি ;
গরবিনি, তোর কিসে তবে গৌরব ?
  রূপগুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি ?

কালো আঁখিপুটে শিশির-অশ্রু ঝরে—
  ফুল কহে, মোর কিছু নাই—কিছু নাই ;
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া করে'
  আমি শুধু ভাই, তাই—আমি শুধু তাই ।
ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাই নাকো,
  পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান ;
প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক ?
  বিবাহ-বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মাণ ।

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা—শুধু পূজা—জীবনের মোর ব্রত ;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী—তিনিও তোমারি মত ?

॥ অনুশীলনী ॥

১। অপরাজিতা ফুলের চেয়ে অন্যান্য ফুলের গৌরব অনেক বেশি—কেন ?

২। অপরাজিতা ফুলের যথার্থ গৌরব কিসে ? মানুষের যথার্থ গৌরব বা পরিচয় কিসে ?

৩। সরল ভাষায় বুঝিয়ে দাও : (ক) কালো আঁখিপুটে.........কিছু নাই।
(খ) মোর ঠাঁই শুধু.........তোমারি মত ?

৪। **কর্মশিক্ষা** ॥ বিভিন্ন ঋতুতে ফোটে এমন নানারকম ফুল সংগ্রহ করে অ্যাল্বামে সাজাও—নাম দাও 'পুষ্পালি'।

৫। অর্থ শেখো :—নয়নাভিরাম, কাঞ্চনভাতি, বিড়ম্বনা, ম্রিয়মাণ।

ভারত-গাথা

অতুলপ্রসাদ সেন

বল, বল, বল সবে শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

বিদূষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি—
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।

অনলে দহিয়া রাখে যাঁরা মান,
পতি-পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ—
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;
নানক নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।

ভুলি' ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান
ত্রিশ কোটি দেহ হবে একপ্রাণ,
একজাতি প্রেমবন্ধনে।

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে ;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে, আবার জাগিবে।

আনিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য,
আসিবে, আবার আসিবে।

এস হে কৃষক কুটিরনিবাসী,
এস অনার্য গিরিবনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,
মিল হে মায়ের চরণে।

এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পরহিতব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান,
মিল হে মায়ের চরণে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। কবি যেভাবে ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী স্মরণ করেছেন তা বর্ণনা কর। ভারতের সম্পর্কে তিনি কী স্বপ্ন দেখেছেন ? এ স্বপ্ন সার্থক করার জন্য কবি কাদের আহ্বান করেছেন ?

২। **কর্মশিক্ষা** ॥ (ক) কয়েকটি প্রকল্পসূচি গ্রহণ কর—"ভারতবালা" "ভারত-ধর্মপুরুষ," "একজাতি একপ্রাণ একতা"। ছবি, চার্টে প্রদর্শনী সাজাও।

(খ) ভারত-মনীষীদের বাণী সংকলন কর। বুদ্ধ, অশোক, নানক, নিমাই, দাদু, কবীর, বিবেকানন্দ, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ—এঁরাই তোমার আদর্শ।

মানকুমারী বসু

রাত-দিন ঝম্‌ঝম্ রাত-দিন টুপ টুপ,
কি সাজে সেজেছে রাণী ! এ কি আজ অপরূপ !
আননে বিজলী-হাসি, গলায় কদম-হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা—এ আবার কি বাহার !
শিখী নাচে, ভেক গায়, মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দভরে কত করে আয়োজন !
ডুবেছে রবির ছবি, ডুবেছে চাঁদিয়া তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে তরল রজত-ধারা !
উথলিছে গঙ্গা পদ্মা, পরানে ধরে না সুখ
মরমে রয়েছে ছেয়ে তোমারি স্নেহের মুখ।
ভিজে গেল—ভেসে গেল, ডুবে গেল ধরাখান,
গলে গেল, মেতে গেল মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ।
প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ শ্যামল সুন্দর বাসে,
চাহিলে তাহার পানে কত কি যে মনে আসে !

প্রাণ গলে—মন গলে—দিগন্ত অনন্ত গলে,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে যেন প্রেমের তুফান চলে।
শরৎ বসন্ত শীত জানে শুধু হাসাহাসি,
বরিষা! তোমারি বুকে অনন্ত প্রেমের রাশি।
সাধে কি বেসেছি ভাল, সাধে কি আপনা ভুলে
দিয়েছি হৃদয়খানি তোমারি চরণ-মূলে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। বর্ষাকালের প্রকৃতির রূপ বর্ণনা কর। এই সময়ে কবির মনে কোন্ ভাবের উদয় হয়েছে?

২। সরল ভাষায় বুঝিয়ে দাও :

(ক) ডুবিছে রবির ছবি ………তরল রজত ধারা!

(খ) প্রাণ গলে—মন গলে…………তুফান চলে!

৩। অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার শেখো : শিখী, বসুধা, ব্রহ্মাণ্ড।

৪। **কর্মশিক্ষা** ॥ 'প্রকৃতি-কোণ' নাম দিয়ে একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প নাও। বর্ষাকালের ফুল, ফল ও প্রাণীর তালিকা প্রস্তুত কর। বর্ষাঋতুকে উপলক্ষ্য করে বাংলাভাষায় যে সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে, তার কিছু কিছু সংগ্রহ করে চার্ট তৈরি কর।

৫। **বিদ্যালয়-কৃত্যালি** ॥ বর্ষাঋতু ভাল, কি শীতঋতু ভাল—এ বিষয়টি অবলম্বনে বিতর্কানুষ্ঠানের আয়োজন কর। ছয় ঋতুকে উপজীব্য করে গীতি-আলেখ্য নিবেদন কর সঙ্গীত-শিক্ষকের পরিচালনায়।

বর্ষা- প্রকৃতির রূপ বর্ণনা এই কবিতার মূল বিষয়।
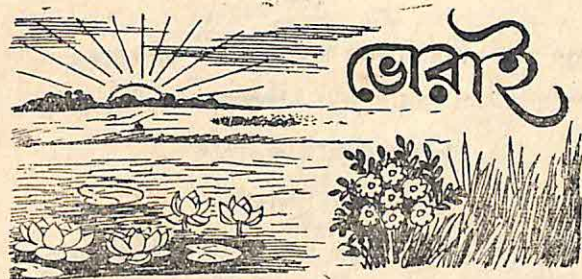
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভোর হল রে, ফর্সা হল, দুল্‌ল উষার ফুল-দোলা !
আন্‌কো আলোয় যায় দ্যাখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা !
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে
অথই নিথর পাথার-জলে—
আল্‌পনা দ্যায় আল্‌তো বাতাস, ভোরাই সুরে মন্ ভোলা !

ধানের ক্ষেতের সব্‌জে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে !
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে !
আলোয় মাঠের কোল ভরেছে
অপ্‌রাজিতায় রং ধরেছে—
নীল-কাজলের কাজললতা আস্‌মানে চোখ ডুবিয়েছে !'

কল্পনা আজ চলছে উড়ে হালকা হাওয়ায় খেল্ খেলে' !
পাপড়ি-ওজন পান্‌সি কাদের সেই হাওয়াতেই পাল পেলে !
মোতিয়া মেঘের চামর পিঁজে
পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে—
পদ্মফুলের অঞ্জলি যে আকাশ-গাঙে যায় ঢেলে !

পুব গগনে থির নীলিমা ভুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে !
পশ্চিমে মেঘ মেল্‌ছে জটা—সিংহকেশর ফুলিয়েছে !
হাঁস চলেছে আকাশপথে
হাসছে কারা পুষ্পরথে—
রামধনু-রং আঁচল তাদের আলো-পাথার তুলিয়েছে !

শিশিরকণায় মাণিক ঘনায়, দূর্বাদলে দীপ জ্বলে
শীতল শিথিল শিউলি-বোঁটায় সুপ্ত শিশুর ঘুম টলে।
আলোর জোয়ার উঠছে বেড়ে
গন্ধ-ফুলের স্বপন কেড়ে
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে রঙের ঝিলিক্‌ ঝল্‌মলে !

॥ অনুশীলনী ॥

১। ভোরবেলায় আকাশ, মেঘ, মাঠ-ঘাট, ধানের ক্ষেত, ফুল, পাখি—ইত্যাদি কবি যেভাবে দেখেছেন, তুমিও যেন তা নিজের চোখে দেখেছ—ঠিক সেইভাবে বর্ণনা কর।

২। সরলার্থ কর : (ক) আলোয় মাঠের………চোখ ডুবিয়েছে !
(খ) মোতিয়া মেঘের………আকাশগাঙে যায় ঢেলে !
(গ) শিশিরকণায় মাণিক…… ঘুম টলে !

৩। অর্থ শেখো : নিদ্‌মহল, নিথর, আস্‌মান, আলো-পাথার।

৪। এ কবিতায় সকালবেলার অনেকগুলো চমৎকার বর্ণনা আছে। যারা ছবি আঁকতে পার, তারা চেষ্টা কর পেন্সিল বা তুলির রেখায় ভোরের ছবি ফুটিয়ে তুলতে।

আমি গাহি তারি গান

কাজী নজরুল ইসলাম

—গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।···
—সেদিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে।
ফিরিল না প্রাতে যে-জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে
নব জগতের শর-সন্ধানী অসীমের পথ-চারী,
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যুদুয়ারে দ্বারী!

সাগরগর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে
জীবনোদ্বেগে তাড়া করে' ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মাণিক আহরি' আনে যারা খুঁড়ি' পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হতে মণি চুরি।

হানিয়া বজ্রপাণির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি'
যাহারা চপল মেঘকন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।
পবন যাদের ব্যজনী ঢুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী—
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি।
গুঞ্জরি' ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে!
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনী উষা ঘুম টুটি' ঐ হাসে!

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম'—কবি যাঁদের উদ্দেশে প্রণাম জানাতে চান তাঁরা কারা? তাঁদের জন্য কবি গান রচনায় অভিলাষী কেন?

২। জ্ঞান-বিজ্ঞান-অভিযানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা নতুন জগতের আবিষ্কারক, এমন কয়েকজন মনীষী এবং তাঁদের আবিষ্কার বা কীর্তির নাম লেখ।

৩। সরল ভাষায় বুঝিয়ে দাও:

(ক) সেদিন নিশীথ·········ফিরিল না কূলে।
(খ) নবজগতের শরসন্ধানী·········মৃত্যুদুয়ারে দ্বারী!
(গ) হানিয়া বজ্রপাণির·········তাহাদের গান গাহি।
(ঘ) গুঞ্জরি' ফেরে ক্রন্দন·········ঐ হাসে!

৪। বানান ও অর্থ শেখো: আগুয়ান, দুস্তর, জীবনোদ্বেগে, বজ্রপাণি, কিঙ্করী, ব্যজনী।

৫। **কর্মশিক্ষা** ॥ দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য যে সব নির্ভীক বীর, আবিষ্কারক ও অভিযাত্রী জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের ছবি সংগ্রহ কর, বাণী সংকলন কর, তাঁদের অমরজীবন স্মরণ করে বিদ্যালয়ে 'মনীষী-দিবস' বা 'শহীদ দিবস' পালন কর।

৬। সমাস নির্ণয় কর: নিশীথ-বেলা, আকাশ-যান, শর-সন্ধানী, মৃত্যুদুয়ার, যক্ষপুরী, বিষ-জ্বালা, বজ্রপাণি, মেঘকন্যা, আজ্ঞাবাহী, কারাবাস।

দুঃসাহসিক অভিযাত্রী যাঁরা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে
অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে, অদেখাকে
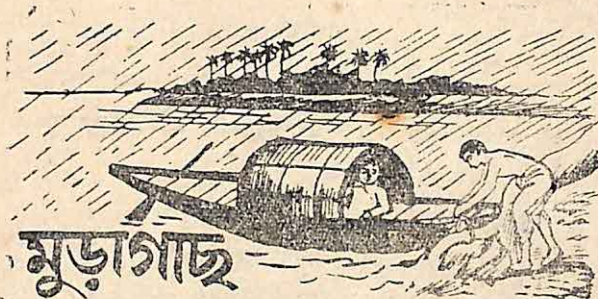
কালিদাস রায়

নৌকা চড়িয়া চলেছি উজানে গঙ্গার বুকে ভেসে
ভাঙনের পাড় ঘেঁসে।
চলিয়াছে মাঝি দাঁড় বেয়ে গান গেয়ে,
ছইয়ের উপরে প্রকৃতির শোভা দেখিতেছি চেয়ে চেয়ে।
ভাঙনের পাড়ে নেই গাছপালা আছে শুধু কাশবন,
গাঙশালিকেরা করিছে সেথায় নর্তন কীর্তন।
হঠাৎ দেখিনু মুড়াগাছ এক একাই দাঁড়ায়ে আছে,
একটি পাতা বা ডালপালা নেই গাছে।
সে-ও দেখি দুটি শিকড় বাড়ায় ভরা গঙ্গার পানে!
সে-কি আশা করে এখনো বাঁচিতে প্রাণে?

আশ্বিন মাস। ফিরিবার পথে সহসা উঠিল ঝড়।
সাঁঝের আকাশে মেঘ ডাকে কড় কড়।
নৌকা তখন টলমল করি ভাটিতে ছুটিয়া ধায়,
সামলানো হল দায়।
প্রাণপণে ডাকি, "বাঁচাও হে ভগবান,
সাঁতার জানি না, অতল পাথারে যায় বুঝি আজ প্রাণ।"
বলিনু "ও মাঝি, কিনারায় নে রে নৌকাটা তাড়াতাড়ি।
বেঁচে ফিরি যদি বাড়ি
খুশি করব রে ভালরূপে বকশিসে।"
কহিল মাঝিরা—"কিনারায় নেব, নৌকা বাঁধব কীসে?"

প্রাণ করে তুক তুক,
ভয়-ভাবনায় শুকায়ে গিয়েছে দেখি তাহাদেরো মুখ।
এমন সময়, একী
ডাইনের পাড়ে সেই মুড়াগাছে দেখি।
মাঝি একজন লাফ দিয়ে পড়ে' জলে
নৌকার রশা সেই মুড়াগাছে বাঁধিল হাতের বলে।
শিকলে বন্দী শ্বাপদের মত তরী দেয় লাফঝাঁপ ;
বলিনু মাঝিরে—"খুব বাঁচালি রে, বাপ!"
বলিল সে মাঝি, "মোদের ক্ষমতা কতটুকু বাবু আছে ;
নৌকা তোমার বাঁচালো ও মুড়াগাছে।"

সমস্ত রাত থামিল না ঝড়। চলিল বৃষ্টিপাত,
মুড়াগাছে বাঁধা নৌকায় আমি কাটালাম সারা রাত।
তখন ভাবিনু—এমন মানুষও আছে,
আর্ততারণে তফাৎ নেইক তাতে আর মুড়াগাছে।
যারা এ জীবনে হয়েছে সর্বহারা,
পরের জন্য তারা তবু রয় খাড়া।
যে দীন ভিখারী নির্জন মাঠে জীর্ণ কুটীরে রয়,
ঘোর দুর্যোগে দিতে পারে সেও রাত্রির আশ্রয়।
কারে যে কখন হয় প্রয়োজন বলিতে তাহা কে পারে ?
অবহেলা ঘৃণা করি বলো তবে কারে ?

।। অনুশীলনী ।।

১। নদীর পাড়ে মুড়াগাছ দেখে কবির প্রথমটা কী মনে হয়েছিল ?

২। ঝড়ের রাতে কবি কীভাবে রক্ষা পেলেন ? তুচ্ছ মুড়াগাছের নিকট তিনি কী নতুন শিক্ষা পেলেন ?

৩। সরলার্থ কর : (ক) শিকলে বন্দী শ্বাপদের..........লাফঝাঁপ।
(খ) কারে যে কখন.........বলো তবে কারে ?

৪। অর্থ শেখো : শ্বাপদ, আর্ততারণ, দুর্যোগ।

৫। তোমার দেখা কোন দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

অযোধ্যা স্টেশনে

হুমায়ুন কবির

শুনিনু নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
হেরিলাম স্বর্ণপুরী। পথে-পথে তার
শত-শত নরনারী কাঁদে অবিরাম,
আর্তকণ্ঠে নভোতলে ওঠে হাহাকার।
তরুণ দেবতা সম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি' চলিয়াছে বনে—
সীতার বিরহ-ভয়ে পুরী অন্ধকার,
গগন শ্বসিয়া ওঠে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে।

চমকি' উঠিনু জাগি'। তপ্ত নিদাঘের
মূর্ছিত ভুবন ভরি' রৌদ্রানল জ্বলে।

স্টেশন অঙ্গনে ডাকে গ্রীষ্মাতুর স্বরে
অযোধ্যার নাম। ধূসর ধূলির 'পরে
বসে আছে বানরের দল। দূরে ঝলে
সূর্যালোকে স্বর্ণচূড়া ভগ্ন মন্দিরের॥

॥ অনুশীলনী ॥

১। অযোধ্যা কোথায় অবস্থিত? রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যায় কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করতেন? সে বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কী?

২। রামের বনবাসযাত্রার কারণ কী? রামের বনবাস-যাত্রাকালে অযোধ্যা-পুরীর কী অবস্থা হয়েছিল? আজকের অযোধ্যা স্টেশনের কী দৃশ্য কবির চোখে পড়েছিল?

৩। সরলার্থ কর: ধূসর ধূলির .....ভগ্ন মন্দিরের।

৪। অর্থ শেখো: আর্তকণ্ঠে, নভোতলে, হাহাকার, শ্বসিয়া, নিরুদ্ধ, নিদাঘ, রৌদ্রানল, গ্রীষ্মাতুর, ঝলে।

৫। **কর্মশিক্ষা**॥ "মাটির পুতুলে রামচরিত" নাম দিয়ে একটি কর্মপ্রকল্প গ্রহণ কর। রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে পুতুল তৈরি কর, পটচিত্র আঁক—ছোট ছোট বাক্সের ফ্রেমে। এক একটি বাক্যে ঘটনাগুলির পরিচয়লিপি লেখো। বিদ্যালয়ের চিত্র-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তোমাদের প্রকল্পের কাজ শেষ হলে প্রদর্শনীর আয়োজন কর।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: স্বর্ণপুরী, নরনারী, অবিরাম, আর্তকণ্ঠ, নভোতল, বিরহ ভয়ে, রৌদ্রানল, গ্রীষ্মাতুর, সূর্যালোক, স্বর্ণচূড়া।

●

জীবনানন্দ দাশ

নিখিল আমার ভাই,
কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই;
যে প্রাণ গুমরি' কাঁদিছে নিরালা শুনি যেন তার ধ্বনি,
কোন ফণী যেন আকাশ বাতাসে তোলে বিষ-গরজনি।
কী যেন যাতনা মাটির বুকেতে অনিবার ওঠে রণি',
আমার শস্য-স্বর্ণ-পসরা নিমেষে হয় যে ছাই!
—সবার বুকের বেদনা আমার, নিখিল আমার ভাই।

আকাশ হতেছে কালো
কাহাদের যেন ছায়াপাতে হায়, নিভে যায় রাঙা আলো!
বাতায়নে মোর ভেসে আসে যেন কাদের তপ্ত শ্বাস,
অন্তরে মোর জড়ায়ে কাদের বেদনার নাগপাশ,
বক্ষে আমার জাগিছে কাদের নিরাশা গ্লানিমা ত্রাস,
—মনে মনে আমি কাহাদের হায় বেসেছিনু এত ভালো!
তাদের ব্যথার কুহেলি-পাথারে আকাশ হতেছে কালো।

লভিয়াছে বুঝি ঠাঁই
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোন-ভাই।

॥ অনুশীলনী ॥

১। কবি বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত মানুষের দুঃখ নিজের বুকে বহন করেছেন—কীভাবে? কবি কাদের ভালোবেসেছেন?

২। সরল ভাষায় বুঝিয়ে দাও: (ক) কী যেন যাতনা…হয় যে ছাই!
(খ) লভিয়াছে বুঝি ঠাই……নিখিলের বোন-ভাই!

৩। অর্থ শেখো: স্বর্ণ-পসরা, গ্লানিমা, কুহেলি-পাথার।

৪। **কর্মশিক্ষা** ॥ তুমি শুধু বাঙালী নও, শুধু ভারতবাসী নও—তুমি বিশ্বের এক সন্তান—সেটাই তোমার প্রকৃত পরিচয়। শিক্ষকমহাশয়ের সাহায্যে তাই দেশবিদেশের মানুষের সম্পর্কে জানতে চেষ্টা কর। নানা দেশের ডাক-টিকিট সংগ্রহ করে অ্যাল্‌বাম সাজাও।

●

কবির বিশ্বপ্রেম এবং বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত মানুষের জন্য কবির দুঃখ বহনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

রাখাল ছেলে

জসীম উদ্দীন

রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও ?

'ওই যে দেখ নীল-নোয়ানো সবুজঘেরা গাঁ'
কলার পাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা !
সেথায় আছে ছোট্ট কুটীর সোনার পাতার ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর-রঙে নাওয়া ;
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড়ো না !'

রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, আবার কোথা ধাও,
পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।

'ঘুম হতে জেগেই দেখি শিশির ঝরা ঘাসে
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত-হাওয়া, ভাই,
সরষে ফুলের পাপড়ি নাড়ি' ডাকছে মোরে তাই।

চল্‌তে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দু'খান পা—
বল্‌ছে যেন, গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা!
সারা মাঠের ডাক এসেছে—খেলতে হবে ভাই,
সাঁঝের বেলা কইব কথা, এখন তবে যাই!'

রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, সারাটি দিন খেলা—
এযে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।

'কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি,
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলী।
ঝাউএর ঝাড়ে বাজায় বাঁশি পউষ-পাগল বুড়ি—
আমরা সেথা চষতে লাঙল মুর্শিদাগান জুড়ি।
খেলা মোদের গান-গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল-চষা,
সারাটা দিন খেলতে পারি, জানিইনে কো বসা॥'

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'সারাটা দিন খেলতে পারি, জানিইনে কো বসা'—রাখাল ছেলে তার সারাদিনের খেলার বর্ণনা কীভাবে দিচ্ছে? এগুলি কি সত্যিই খেলা, না কাজ? রাখাল ছেলের কাছে তার কাজগুলি কখন 'খেলা' হয়ে উঠছে?

২। মা, মাঠ আর মাটি—এ তিন যেন রাখাল ছেলের প্রাণের বীণ। এ কবিতায় কীভাবে সে-কথা বলা হয়েছে?

৩। সরলার্থ কর: (ক) সাঁঝ-আকাশের..... আবীর রঙে নাওয়া।
(খ) সারা মাঠের ডাক এসেছে—খেলতে হবে ভাই।
(গ) কাজের কথা জানিনে... মুর্শিদাগান জুড়ি।

৪। সমাস নির্ণয় কর: নীল-নোয়ানো, সাঁঝ-আকাশ, শিশির-ঝরা, পউষ-পাগল, মুর্শিদাগান, লাঙল-চষা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা,
করি গোটাকয়েক আইন জারি
দু'এক জনায় খুব কষে দিই সাজা।

মেঘগুলোকে করি হুকুম সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টিফোঁটার ফেলি' চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিলদরিয়া মেজাজ করে' কই :
বাজগুলো সব স্ফূর্তি করে' বাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা।

হাওয়ায় বলি, হল্লা করে' চল্
তারার বাতি নিভিয়ে দলে-দল,
অন্ধকারে সত্যি-কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।

ঘুমের পুরীর সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধরে খুব কষে দিই সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা।

ওলট-পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা ;
মনের মতো কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব করে' নিই ঘটা।
সত্য তা সে যতই বড় হোক
কঠোর হলে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা।

॥ অনুশীলনী ॥

১। শিশুকে এক রাতের জন্য রাজা করে দিলে সে কী কী করতে চাইবে ?
২। মেঘ, বাজ, হাওয়া, সেপাই—এদের শিশু কী কী হুকুম করবে ?
৩। সরলার্থ কর : (ক) বৃষ্টিফোঁটার ···· স্ফূর্তি করে বাজা।
(খ) হাওয়ায় বলি······পদ্মাবতীর দেশে।
(গ) সত্য তা সে যতই····· দিই তাহারে সাজা।
৪। 'আমি যদি দেশের রাষ্ট্রপতি হতাম'—এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো।

ভাঙলো যখন দুপুরবেলার ঘুম

অশোকবিজয় রাহা

ভাঙলো যখন দুপুরবেলার ঘুম
পাহাড়-দেশের চারদিক নিঃঝুম,
বিকেলবেলার সোনালি রোদ হাসে
গাছে পাতায় ঘাসে।
হঠাৎ শুনি ছোট্ট একটি শিস—
কানের কাছে কে করে ফিসফিস ?
চমকে উঠে ঘাড় ফিরায়ে দেখি,
এ কী !
পাশেই আমার জান্‌লাটাতে পরীর শিশু দুটি
শিরীষ গাছের ডালের 'পরে করছে ছুটোছুটি।

অবাক কাণ্ড—আরে !
চারটি চোখে ঝিলিক খেলে একটু পাতার আড়ে !
তুলতুলে গাল, টুকটুকে ঠোঁট, খুশির টুকরো দুটি
পিঠের 'পরে পাখার লুটোপুটি,
একটু পরেই কানাকানি, একটু পরেই হাসি—
কচি পাতার বাঁশি—

একটু পরেই পাতার ভিড়ে ধরছে মুঠোমুঠি
রাংতা-আলোর বুটি।
এমন সময় কানে এলো পিটুল পাখির ডাক,
একটু গেল ফাঁক—
এক ঝলকে আর-এক আকাশ চিড় খেয়ে যায় মনে
আরেক দিনের বনে—
তারি ফাঁকে পাৎলা রোদের পর্দাটুকু ফুঁড়ে
এরাও গেল উড়ে,
রইলো পড়ে' ঝরা পাতা, রইলো পড়ে' ঢালু,
পাহাড়-ধসা লাল গুহাটার হাঁ-করা ঐ তালু॥

॥ অনুশীলনী ॥

১। ঘুমভাঙা বিকেলবেলায় কবি যা যা দেখেছিলেন তা নিজের ভাষায় গুছিয়ে বল।

২। সরলার্থ কর : (ক) পাশেই আমার জান্‌লাটাতে……ছুটোছুটি।
(খ একটু পরেই কানাকানি……রাংতা-আলোর বুটি।
(গ) রইলো পড়ে ঝরা পাতা… হাঁ-করা ঐ তালু।

৩। কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাও।

আমাদের দেশে ঘুমভাঙা বিকেলবেলায় কবি যা যা দেখেছিলেন, শুনেছিলেন তাই বর্ণনা দিয়েছেন এই কবিতায়.

কিরণশংকর সেনগুপ্ত

কে আমাকে বুকে রাখবে শিশুর মতন ?
বাংলা দেশ।
কে জড়ায় চেতনা আমার সস্নেহ প্রত্যয়ে ?
বাংলা দেশ।

কে আমাকে দিন থেকে রাতে
রাত থেকে দিনে
অবিরাম স্পর্শধন্যতায়
প্রত্যেক নিমেষে
নিয়ে যায় ?
বাংলা দেশ।

প্রখর গ্রীষ্মের দিনে, মেঘ বৃষ্টি জলে
হেমন্তে শরতে শীতে, বসন্তে বন্যায়
কে নিমেষে নিয়ে যায় ?
প্রচ্ছন্ন স্বদেশ
এই বাংলা, খণ্ডিত প্রদেশ।

গঙ্গায় পদ্মায় একাকার
জনমে মরণে বাঁধে সেতু
অজেয় প্রাণের বাংলা,
এই বাংলা দেশ ॥

॥ অনুশীলনী ॥

১। এপারের পশ্চিমবঙ্গ, ওপারের বাংলাদেশ—এ দুই মিলে কবির জন্মভূমি বাংলা। সেই বাংলার গৌরব কবি কীভাবে স্মরণ করেছেন, লেখো।

২। সরল ভাষায় বুঝিয়ে দাও : (ক) কে জড়ায় চেতনা····· প্রত্যয়ে ?

(খ) কে আমাকে দিন থেকে······নিয়ে যায় ?

(গ) গঙ্গায় পদ্মায়······এই বাংলা দেশ।

৩। অর্থ লেখো : সস্নেহ প্রত্যয়, স্পর্শধন্যতা, প্রচ্ছন্ন।

৪। **কর্মশিক্ষা** ॥ একটি কর্মপ্রকল্প গ্রহণ কর—নাম দাও "বাংলা দেশ"। পাকিস্থানের শাসনে জর্জরিত হয়ে পূর্ববঙ্গ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক মুক্তি যুদ্ধ শুরু করে ১৯৭১ সালে বিজয়ী হয়েছিল এবং স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করেছিল, তার তথ্য জোগাড় কর, সে সম্পর্কে চার্ট তৈরি কর। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' গাইবার অভ্যাস কর।

চিরদিনের

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে—
পথ নেই, তবু এখানে যে পথ হাঁটা।

এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস
এ গ্রাম নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।

রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে
কিষানকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত।

দুর্ভিক্ষের আঁচড় জড়ানো গায়ে
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।

রাত্রি হলেই দাওয়ার অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে,
কেমন করে' সে-আকালেতে গতবারে
চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে।

এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে
কামার, কুমোর, তাঁতি তার কাজে জোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষীর কানে
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ যে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোম্‌টা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে॥

॥ অনুশীলনী ॥

১। কবির দৃষ্টিতে তার জন্মভূমির গ্রামের যে রূপটি ধরা পড়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১। 'আকাল' অর্থ কী? ছিয়াত্তরের আকাল—যার বর্ণনা আছে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে, তার কথা পড়ে নাও।

৩। সরলার্থ কর: (ক) গোয়ালে পাঠায়……ঘাগরা পরে।
(খ) বুড়ো বটতলা……জড়ো করে জনমত।
(গ) সারাটা দুপুর……বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।
(ঘ) ঘোম্‌টা তুলে সে……সুবর্ণ যুগ আসে।

৪। পদ পরিবর্তন কর: গ্রাম, সন্ধ্যা, ঘোষিত, বিচিত্র।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মেঘে মেঘে ঢ্যাম্ কুড়কুড়
বাজনা বাজে গাজনের।
বাবুই, তোমার বাসা উড়ুক
নতুন দিনের বাতাসে।
ঘর ছেড়ে আজ বাইরে এসো,
ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
ফুঁ দাও।
হাওয়ার মুখে ওড়াও ছেঁড়া
ইতিহাসের পাতা।

ঝড় উঠেছে, বাইরে এসো
ঝড়ের সঙ্গে ফুঁ দাও।

আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে
কে কাঁদে কে ?
চোখ মুছিয়ে দুচোখে তার
আগুন দাও জ্বেলে।
এবার বাসাবদল নতুন
ইতিহাসের ডালে—
মেঘে মেঘে বেজে উঠুক
ঢ্যাম্ কুড়কুড় বাজনা ;
কড়কড়িয়ে ডাকুক বাজ। তারপর—
মাঠে মাঠে জল ছিটিয়ে
বৃষ্টি পড়ুক মন্ত্র ঃ
শান্তি শান্তি শান্তি ॥

॥ অনুশীলনী ॥

১। গাজন মানে কী? গাজনের গানের পিছনে কবি যে নতুনের ও বিদ্রোহের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন তা নিজের ভাষায় গুছিয়ে বল।

২। সরলার্থ কর ঃ (ক) হাওয়ার মুখে……ইতিহাসের পাতা।

(খ) আকাশ জুড়ে……আগুন দাও জ্বেলে।

(গ) এবার বাসাবদল নতুন ইতিহাসের ডালে।